পূর্বক্ষণ



পূর্বক্ষণ ॥ সত্য স্বপ্ন আর কান্নায় ॥ ছবি ॥ বুড়ো লোকটার গল্প ॥ বাদা ॥ নব দেবদারু ॥ গান্ধারী ॥ জন্মভূমি

এই লেখকের অন্যান্য রচনাবলী

ধুলোমাটি ॥ ধানকানা ॥ আগন্তুক

দুর্লক্ষণ

ননী ভৌমিক





কলিকাতা । বারো:

প্রথম প্রকাশ
কবিপক্ষ
১৮৭৯ শকাব্দ

প্রকাশিকা
আভারাণী মিত্র
৪৬।৭, হ্যারিসন রোড
কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদপট
পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রাকর
শ্রীমোদনারায়ণ দাস
মুদ্রক মণ্ডল লিমিটেড
১১৪, ১১৬, বলরাম দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

দাম দু'টাকা

পূর্বক্ষণ

দরজাটা খোলা আছে। আমি যেখানে বসে আছি, সেখান থেকে চোখে পড়ে না। কিন্তু জানি খোলা আছে। খোলা দরজা দিয়ে আমি এসেছি। দরজা খুলে দিয়ে ও আস্তে করে বলেছেঃ

শোনো।

বলো। আস্তে করে বলি আমি। তারপর চুপ করে থাকি আমরা। ও কি একটা বলতে চেয়েছে, কি একটা শুনতে। আমি কি একটা শুনতে চেয়েছি কি একটা বলতে। কিন্তু কিছু না বলে একটুখানি চুপ করে থাকি আমরা। চুপ করে একালের ম্লান একখানা ঘরে।

ও জানে আমাকে। আমি জানি ওকে। নানা পথ ঘুরে আমি এসেছি। নানা লোক, নানা কাজ, নানা হিসেব। নানা পথ ঘুরে ও এসেছে। নানা লোক, নানা মোড়, নানা দায়। একটা জগৎ আছে বাইরে। সেই বাইরের রাস্তায় ও একদিন আমার মুখের দিকে চেয়ে থামল একটু। ও রূপসী নয়। আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে থামলাম। আমি বীর নই। আর আমি জানি ও অনেক সয়েছে। ও জানে আমি অনেক দেখেছি। তারপর দরজা খোলা রেখে একটু বসি আমরা। আমরা একালের একটা ঘরে।

একটু ইতস্তত করেছে ও। আর কিছু বলে নি। সমস্ত ঘরখানা ভরে উঠেছে না-বলায়, চুপ করায়। সমস্ত ঘরে না-বলা না-শোনা মিড়ের একটা গুনগুন। দুর্বাঘাসের কানে ফাল্গুন হাওয়ার একটা

বেহালা। ও রূপসী নয়। তবু ওকে চোখ মেলে দেখতে চাই আমি। তাকাই। ও কি করছে দেখি, নাকি আমার কি হচ্ছে শুনি। ও রূপসী নয়, কিন্তু সহসা মনে হয় আমার, ও অপরূপ। কি একটা বলতে চাইছিল ও, না বলে চুপ করে আছে। আমি কিছু একটা বলতে চাই। আমি জানাতে চাই ও সুন্দর। ও জানে না ও কি আশ্চর্য সুন্দর। তাই ও যখন চুপ করে আছে, তখন আমি আস্তে করে বলি, শোনো !

আর তখন ঘরের মধ্যে একটা ভ্রমর আসে গুনগুনিয়ে। কি মায়া লাগল চোখে। আহা, মায়া লাগুক, মোহ। সুর লাগুক ততখানি যতখানি ও নিজে সুন্দর। ও রূপসী নয় তবু অপরূপ এই কথা জানাতে চেয়েছি আমি। ও শোভা নয়, সুরভি। আস্তে করে বলেছি ঃ শোনো। কি বলছি সেটা কিছু নয়, কি সুর লাগছে।

আর অপেক্ষা করি আমি নিজে। কান পাতি নিজের গলার স্বর শোনার জন্যে। চমকে ওঠি ঃ যা শোনাতে চাই তা শুনছি না। একটা ভ্রমর এসেছে ঘরে। না, ভ্রমর না মাছি। না, মাছি না, কিছু না। কিছুই না।

কিছুই না, কোনো কথাই আর বলি না আমি। কোনো কথা না বলে ও চুপ করে আছে অন্যদিকে চেয়ে। আমি জানি এই চুপ করাটা বানানো। ও জানে না ও সেটাকে বানিয়েছে কিনা। আমি জানি না আমি সেটা বানিয়ে তুলতে চাই কিনা।

তবু আমি জানি এর মানে কি। এ শুধু মোহ। এ শুধু বানানো। আমরা যা নই, তাই আমরা বানাতে চাই নিজেদের। এ শুধু ছায়া। একালের ম্লান এই ঘরখানায় আমাদের বানিয়ে নেওয়া ছায়ার আলপনা। আর সব জানা। জানা।

একদা জানা ছিল না অনেক। জানা ছিল না কিসের পর কি। কিসের মধ্যে কি। তাই সৃষ্টি হয়েছে বৃহৎ ট্রাজেডি, মহৎ মাধুর্য। পৃথিবীতে রূপসী নেমে এসেছে। জেগেছে বীর। আবেগ বেজেছে

সপ্তমে। আমাদের সপ্তম নেই, এ শুধু এক মামুলী সপ্তক। একক নয় মিশেল। আর মামুলী। আর জানা। কিসের মধ্যে কি, কিসের পর কি। ওকে জানি আমি। ও আমাকে।

ও জানা। আমি জানি নানা পথ ঘুরে এসেছে ও। নানা লোক, নানা মোড়, নানা দায়। বাইরের একটা অস্থির জঙ্গমতা বিপুল চিৎকার তুলে যান্ত্রিক বাধ্যতায় বেগার খেটে চলেছে দিনরাত। সেই বাইরের রাস্তায় ওর সঙ্গে আমার দেখা। সেই জঙ্গম জগৎটার একটা অংশ আমরাও। একটা টুকরোই। আমাদের জায়গা কোথায় তা জানা। কোন মেসিনের সামনে দিন ক'ঘণ্টা করে দিতে হবে জানি। কি করে বদলাতে হবে, কি করে অপেক্ষা করতে হবে। আর তাই নানা লোক নানা দায় নানা মোড় পেরিয়ে চলেছে ও। আমি। বিনা উত্তেজনায়, বিনা রোমাঞ্চে। তাই ভিড়ের মধ্যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় ও। রুজি রোজগারের মেহনত করার পর দোকান থেকে কিছু কেনাকাটা করে। কখনো সিনেমায় যায় কখনো মিছিলে। কাউকে দেখে হাসে, কারো সঙ্গে দুটো মিষ্টি কথা বলে, কারো জন্যে প্রতীক্ষা করে হঠাৎ। যা সত্যি নয় তাই বলতে চায়। যা বলে তা সত্যি হয় না। কাউকে ঠকায়, কাউকে ফেরায়, কাউকে ভুল বোঝায়। তারপর রুজি-রোজগারের জন্যে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যায় আবার। আর জীর্ণ হয়, আর জীর্ণ হয়, জীর্ণ। একটা নির্ভুল জঙ্গমতা বদলে যাবার আগে জীর্ণ করে চলেছে দিনরাত। বাইরের সেই রাস্তায় ও চোখ তুলে তাকিয়েছে আমার দিকে। আমি বলেছি, শোনো।

তারপরেই অনুভব করেছি এটা কি। মায়া নয় মতিভ্রম নয়, এ শুধু অনুকম্পা। হাঁ, অনুকম্পা। চোখ মেলে ওকে দেখি। একালের ম্লান একটি ঘরে ক্লান্ত একটি মেয়ে। অন্যদিকে তাকিয়ে আছে ও। ওর সারা চোহারায় রূপ নয় ক্ষয়। শোভা নয় শ্রান্তি। ওর গালের ওপর অসহ্য ম্লান নীল একটা শিরা ফুটে উঠেছে। ওর গ্রীবার ভঙ্গি

পাখির মতো ভীরু। কাউকে ঠকিয়েছে ও, কাউকে ফিরিয়েছে, কাউকে ভুল বুঝিয়েছে। আর সব মিলিয়ে ও অনেক সয়েছে অনেক। বাইরেটা অনেক বড়ো, আমরা অনেক ছোটো, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আগে আমাদের এক মুহূর্তের আত্মরক্ষা করুণায়। আমাদের শুরু ও শেষ করুণায়। ও অনেক সয়েছে।

আর অসহ্য লাগে ওর গালের ওপরকার ম্লান শিরাটা। আমি জানি আমি কি চাইছি। ওকে করুণা করতে চাই আমি, আর কিছু নয়। ও অনেক সয়েছে, অনেক কষ্ট পেয়েছে। আমাদের জীবন কষ্টের। কাউকে ঠকিয়েছি, কাউকে ফিরিয়েছি, আর সব মিলিয়ে অনেক সয়েছি আমিও। নিজের জন্যে করুণা চাই আমি। তাই করুণা করি ওকে। যা বলতে চাইছিলাম তা বানানো। তাই অন্য একটা স্বর আনতে চাই গলায়। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তাই আবার বলি, শোনো।

চোখ না ফিরিয়েই ও বলে, বলো।

আর ঘরের মধ্যে গুনগুনিয়ে ওঠে একটা স্বর। স্বরটা করুণার। ও কিছুই বলেনি, শুধু বলেছে বলো। আর ছলছল করে উঠেছে একটা স্বর। ও করুণা করে আমাকে। আমি অনেক সয়েছি, আমরা অনেক সয়েছি। বাইরের নিষ্করুণ জঙ্গমতা থেকে এক-একটা মুহূর্ত আমাদের চাই। করুণায় ভেজা। করুণায় বাঁচা। মৃদু শান্ত, ম্লান। করুণা নিয়ে আমি ওর দিকে তাকাই চোখ মেলে। ওর দেহের দিকে। একটা ম্লান ছায়া পড়েছে ওর শরীরে। গ্রীবার ভঙ্গিতে একটা কারুণ্য। কপালের ঢালুতে চূর্ণ আলো। শাড়ি ব্লাউজ। একটু বেঁকে বসেছে ও আমার দিকে না তাকিয়ে। একটা বাহু নেমে এসেছে বেঁকে। ম্লান আভার গুঁড়ো লেপে আলো-আলো হয়ে উঠেছে হাতের রোঁয়াগুলো। শাড়ি, ব্লাউজ। ওর একপাশের বুক-খানা দেখতে পাচ্ছি আমি। ব্লাউজে ঢাকা। ব্লাউজে বাঁকা। ভরা। নিঃশ্বাসের তালে তালে একটু উঠছে, নামছে, উঠছে। একটা

সেপটিপিনের মাথা চোখে পড়ে আমার। বোতাম ছেঁড়া ব্লাউজটাকে ও বিঁধে রেখেছে সেপটিপিন দিয়ে। ঠিকমতো লাগাতে পারে নি। আমার ইচ্ছে হয়, ঠিক করে লাগিয়ে দিই সেপটিপিনটা।

আমি জানি এ শুধু করুণা। ও অনেক সয়েছে। করুণায় নীল ওর গালের ম্লান শিরাটা দেখতে চাই আমি। কিন্তু দেখি না। তাকিয়ে থাকি, কিন্তু তাকিয়ে থাকতে চাই না। একালের একটা ঘর, কিন্তু একালকে খুঁজে পাই না আমি, খুঁজে পাই না কিছুতেই আর ঘরের ম্লান ছায়াটা মনে হয় অন্ধকারের মতো মাতাল। আর বাইরের নিষ্প্রাণ নির্ভুল জঙ্গমটাকে মনে হয় মত্ত মদালস। শেকলে বাঁধা একটা আদিম বৃষ হরপ্পার অন্ধকার থেকে মুখ তুলে ভাঙা ফাটা আহ্বানে ডাকছে তার সঙ্গিনীকে। কুটির প্রান্তের গণ্ডির বাইরে কোন এক কামার্ত রাবণের মহাকাব্যিক পদচারণা। ওর নীল শিরাটার দিকে তাকাতে চাই আমি। বলতে চাই শোনো। কিন্তু কিছুই বলি না আমি, কিছুই ভাবি না। শুধু ঘন, ভারি, আর্দ্র নিঃশ্বাস টানি আমি। ও বলে, কই বলো! আর কিছু না ভেবে না দেখে তাকিয়ে থাকি আমি। ও অনেক দেখেছে, অনেক সয়েছে। আর তাই একটা আশ্চর্য পরিণতি ও জমিয়ে তুলেছে পরতে পরতে ওর মনে, ওর দেহে। একটা ফুল ফুটে উঠেছে তার সবগুলো দল মেলে। একটা মাংসের ফুল। কিছুই বলি না আমি। শুধু তাকিয়ে দেখি। ও শোভা নয়, সুরভি নয়, স্বেদ। ওর ব্লাউজের বাহুমূলের গোল জায়গাটা ভিজে উঠেছে ঘামে, ঘ্রাণে। ওর শাড়ি তেমনি অলস, তেমনি বাঁকা, ভরা ব্লাউজ। সেপটিপিন। উঠছে, নামছে, উঠছে। ভারি আর্দ্র নিঃশ্বাস টানি আমি। ডাকি, শোনো—আর হরপ্পার বৃষের মতো একটা ভাঙা আওয়াজ বেরুতে চায় আমার গলা দিয়ে। কিন্তু না, বেরোয় না। কোনো শব্দই বেরোয় না আমার গলা দিয়ে। শুধু নিঃশ্বাস টানি আমি, ভারি, ভেজা, অন্ধকার।

আর সেই মুহূর্তে ও আস্তে করে বলে, শোনো।

আমি জানি ও গলার স্বর কার। ওর। একালের একটি মেয়ের। কান পাতি! একটা সুর গুনগুনিয়ে উঠছে আর কেটে কেটে যাচ্ছে কয়েকটি সাংসারিক আলোচনায়। একটি মামুলী গলার স্বর। যা শুধু কয়েকটা প্রাসঙ্গিক বিষয় জানায়, কয়েকটা প্রাসঙ্গিক বিষয় জানে। আর বানিয়ে তোলে একটা অপ্রাসঙ্গিক সত্যকে। যাদুকর অন্ধকার ছেঁড়া ছেঁড়া হয়ে হারিয়ে যায় ঘরের ম্লান আলোয়। আমি জানি এই আলোটাই ছিল। এই আলোটাই আছে। ম্লান। মামুলী। প্রাসঙ্গিক।

আমি বলি, বলো।

তারপর ওর দিকে তাকাই। বাইরের দিকে। একটা নির্ভুল জঙ্গমতা বেগার খেটে চলেছে দিনরাত। তার চিৎকার নেই, মত্ততা নেই, বিভ্রম নেই। মসৃণ, নিষ্করুণ, বৃহৎ। বাইরেটা অনেক অনেক বড়ো আমাদের চেয়ে। আমরা ছোটো, তুচ্ছ, টুকরো। কোন মেসিনের সামনে ক'ঘণ্টা দিতে হবে আমাদের জানা। জঙ্গমটা বদলে যাওয়ার আগে কি করে ক্ষয়ে যেতে হবে আমাদের জানি। ওর দিকে তাকাই। নানা পথ, নানা দায়, নানা মোড় ও ঘুরে এসেছে। কাউকে ভুলিয়েছে, কাউকে ঠকিয়েছে, কাউকে ফিরিয়েছে। অনেক সয়েছে ও। অনেক। কিন্তু কেন? অনেক সয়েছি আমি, কেন? অনেক সয়েছি আমরা, তবু অপ্রাসঙ্গিক ; তুচ্ছ, টুকরো, নিষ্ফল, শূন্য।

আমি বলি, বলো। আর কি বলছি সেটা কিছু নয়। কি সুর বাজছে। সুরটা নিষ্ফলতার, শূন্যতার। আর করুণা করতে চাই নিজেকে। না, করুণা করতে চাই না। একটা কষ্ট আছে আমাদের সকলকে ঘিরে। সেই কষ্টের নাম জীবন। কষ্টটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে হবে আমাদের। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকার নাম জীবন। কিন্তু কেন? ঋষিপত্নী বলে ছিল, কি করে মৃত্যুকে অতিক্রম করবো? তার চেয়ে ভালো বুদ্ধের ধ্যান, কি করে জীবন অতিক্রম

করে পৌঁছব শূন্যে, কিছুই না এমন একটা কিছুতে। কিছুই না, কোনো কথাই বলি না আর। ও আমার দিকে না তাকিয়ে অন্যদিকেই চেয়ে আছে এখনো। ও অনেক সয়েছে। কিন্তু কি এসে যায় যদি একটা মেয়ে দৈনিক বরাদ্দ মেহনতের পর দোকান থেকে কিছু কেনাকাটা করে। কাউকে ঠকায়, কাউকে ফেরায়, কাউকে ভোলায়। তারপর আবার হেঁটে যায় ভিড়ের মধ্যে দিয়ে, অনেক পথ অনেক মোড় অনেক দায়ের মাঝখানে। কি এসে যায় যদি কেউ বলে, শোনো, অথবা না বলে। কি এসে যায় যদি আমি বলি বলো, অথবা না বলি। বাইরেটা নিষ্করুণ, মসৃণ। এক মুহূর্তের আত্মরক্ষা আমাদের সাংসারিকতায়, না সাংসারিকতা নয় করুণায়। না করুণায় নয় কামে। না কামে নয় নিষ্করুণ শূন্যতায়। বৃহৎ জঙ্গমটাকে আমরা উত্তীর্ণ হবো শূন্যতায়।

কিছু একটা শুনতে চাই ওর কাছে থেকে। আমাদের মাঝখানে একটা নিষ্পাপ, নিষ্প্রেম শূন্যতা। শূন্যতার ওপার থেকে ও ডেকেছে, শোনো। আমি ওকে ডাকি, বলো। কাছে আসতে চাই আমরা। কিন্তু কাছে আসার মূর্তিটা ফিরে যাওয়ার মতো। শূন্যতার ওপার থেকে ওকে ডাকি। সে ডাকটা ফিরে চলার মতো। শূন্যতার ওপার থেকে আরো ওপারে ওর ফিরে চলা। শূন্যতার এপার থেকে আরো এপারে আমার নিষ্ক্রমণ, এক নিষ্পাপ, নিষ্প্রেম বিশ্বের শূন্যতায় দুই গাণিতিক নক্ষত্র। গাণিতিক সেই শূন্যতায় কাছে আসাটা দূরে চলে যাওয়ার মতো। সীমাটা অনন্তের মতো।

নির্দিষ্ট অনন্তের ওপার থেকে আমি ওকে কিছু একটা বলতে চাই। ডাকি, শোনো। আর চম্‌কে উঠি। কি বলছি সেটা কিছু নয়, কি সুর লাগছে। আর নিষ্প্রেম, নিষ্প্রাণ শূন্যের এপার থেকে চমকে চমকে উঠি আমি। একী! এ কোন কান্নার সুর! নিষ্প্রেম, নিষ্প্রাণ এ কার অসহ্য কান্না। আর্তনাদের মতো করে আমি ডাকতে চাই, শোনো!

কিন্তু কিছুই বলি না আমি। কোনো শব্দই বেরোয় না আমার গলা দিয়ে। শুধু ওর দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকি। একালের ম্লান একটা মেয়ে। অনেক সয়েছে ও, অনেক দেখেছে। অনেক পথ, অনেক মোড়, অনেক লোক। তাই কাঁদতে চাই আমি। কিন্তু কাঁদতে পারি না। শিউরে শিউরে শিউরে উঠি আশঙ্কায়। পরতে পরতে পরিণতি জানিয়ে ফুটে ওঠা ঐ একটা মাংসের ফুল—কিন্তু অন্য কেউ নেবে ওকে। কেননা অনেক পথ, অনেক মোড়, অনেক লোক পেরিয়ে এসেছে ও। অনেক মোড় অনেক লোক পেরিয়ে ও যাবে। দৈনিক বরাদ্দ রুজি-রোজগারের মেহনতের পর কিছু কেনাকাটা করবে দোকান থেকে। কাউকে ফেরাবে, কাউকে ভোলাবে। তারপর আবার হেঁটে যাবে ও অনেক অনেক ভিড়ের মধ্যে।

ম্লান ঘরের বাইরে একটা অন্তহীন উদ্ভট জঙ্গম শেকলবাঁধা এক সার মধ্যযুগীয় কয়েদীর মতো বেগার খেটে চলেছে ঝম্‌ঝম্ শেকল বাজিয়ে। তাদের কদাকার কানা নিষ্ঠুর চোখের কোণে কোণে ধূর্ত হাসি। আর ঝম্‌ঝম্ করে পায়ের বেড়ি বাজছে দিনরাত। আমি জানি, অন্য কেউ ওকে পাবে। অনেক মোড়, অনেক ভিড়, অনেক দায়ের মধ্যে অন্য কেউ। ভিড়ের মধ্যে একদিন ও চোখ তুলে আমার দিকে চেয়েছে। দরজা খুলে দিয়ে বলেছে, শোনো। কিন্তু আর কিছু বলিনি আমরা। আর কিছু বলা হবে না আমাদের। আমি চোখ মেলে ওকে দেখতে চাই। ওর যা দেখেছি, সেটা নয়। যা দেখি নি সেইটে। ও যা বলেছে তা শুনতে চাই না আমি, ও যা বলে নি সেইটে। আর অসহ্য ঈর্ষায় অস্থির হয়ে উঠি। অন্য কেউ ওকে পাবে, কে, কে? অনেক ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ও এসেছে। ভিড়ের মধ্যে কে সে, যে ওকে নেবে? কে? তাহলে আমাকেও নিক অন্য কেউ। ভিড়ের মধ্যেকার অন্য কেউ। কিন্তু তবু ঈর্ষায় কালো হয়ে উঠি আমি। আর আমি জানি, আমিও অনেক ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এসেছি। অনেক মোড়, অনেক দায়,

অনেক পরিচিতা। ঈর্ষায় জ্বলি আমি আর ইচ্ছে করে ওকে বলি, শোনো, সেদিন যাকে নিয়ে সিনেমায় গিয়েছিলাম........। কিন্তু না, কিছুই বলি না আমি। আর একালের এই ঘরখানার ম্লান আলো অন্ধকার হয়ে ওঠে ক্রমে। অন্ধকার নয়, কালো। অসহ্য একটা কান্না গলা ঠেলে আসে আমার, আর কান্নাকে পায়ে মাড়িয়ে প্রেতের মতো স্তব্ধ হয়ে উঠি আমি। কালো একটা ষড়যন্ত্র নিঃশ্বাস চেপে ঘিরে দাঁড়ায় আমাদের চারদিকে। নিষ্প্রেম, নিষ্প্রাণ শূন্যতার চারপাশে ফিস্‌ফিস্ সঙ্কেত। বাক্যহীন, দৃষ্টিহীন একপাল কদাকার কয়েদীর মতো বেগার খাটছে বাইরের উদ্‌ভ্রান্ত জঙ্গম। আমি জানি না। আমি জানি। আমি যা জানি তা জানতে চাই না। যা জানি না, সেইটে। আর বিকৃত গলায় চিৎকার করে বলি, শোনো! কিন্তু কিছুই বলি না আমি। কিছুই বলতে পারি না। একটা অসহ্য কান্না, না কান্না নয় ঈর্ষায় গলা বন্ধ হয়ে আসে আমার! গলা চেপে ধরে আমার! একটা ঈর্ষা আমাকে অস্থির করে তোলে!

ও ইতস্তত করে আবার বলে, শোনো।

আর কান পাতি আমি। ও কি বলছে সেটা কিছু নয়। কি সুর বাজছে। সুরটা বানানো, মিথ্যে। ও বলে, শোনো। আর সমস্ত ঘরখানা কালো হয়ে ওঠে পাপে। মিথ্যের প্রতারণায়। কালো হয়ে ওঠে চারিদিক, আর থেকে থেকে লাল। থেকে থেকে রক্ত। পাপ আর রক্ত। আর ক্ষেপে উঠি আমি এক আদিম অস্থির বৃষের মতো। ওকে ঘৃণা করি আমি। অনেক সয়েছে ও, অনেক দেখেছে। রুজি-রোজগারের মেহনত করার পর ও কিছু কেনাকাটা করেছে। কাউকে ঠকিয়েছে ও, কাউকে ফিরিয়েছে, কাউকে ভুলিয়েছে। তাই ঘৃণা করি ওকে। বাইরের ক্ষ্যাপা জঙ্গমটা পাপে আর রক্তে বীভৎস হয়ে উন্মত্ত চিৎকার করে ছুটে চলেছে দিনরাত। আমিও ক্ষেপে উঠতে চাই এক প্রচণ্ড 'মূর' রাজার মতো প্রতিহিংসায়। ওর দিকে তাকাই আমি। শাড়ি ব্লাউজ। হাতখানা তেমনি

নেমে এসেছে বাঁকা হয়ে। একটা মাংসের ফুল। ফুলটাকে দুই হাতে ছিঁড়ে ওর হৃৎপিণ্ডটাকে দেখতে চাই আমি—পাপে ভরা, পাপে ভীরু একটা হৃৎপিণ্ড। অন্ধকারে রক্তের ঝিলিক দেখতে চাই আমি। পাগল হয়ে উঠতে চাই! আর বীভৎস বিকৃত আর্তনাদে চিৎকার করে উঠি, 'বলো! কি বলো! বলো।'

এতক্ষণে, এতক্ষণে চমকে ফিরে তাকায় ও। আমার দিকে। আমার চোখের দিকে। আর ক্ষ্যাপার মতো আমি তাকাই ওর চোখের দিকে। ওর চোখের অতলে যে পাপ আছে সেই পাপের দিকে। আর কিছু না বলে, কিছু না জেনে, সব বলে সব জেনেও কেবলি তাকিয়ে থাকি আমরা। কেবলি তাকিয়ে থাকি। আর কখন মনে হয় সব কিছু গলে যেতে থাকে আমাদের পায়ের তল থেকে। সব কিছু উত্তীর্ণ হয়ে যেতে থাকি আমরা। জীবনকে উত্তীর্ণ হয়ে যাই আমরা, মৃত্যুকে। আর বড়ো হয়ে উঠি আমরা! ক্রমাগত বড়ো। বাইরের যে জঙ্গমটাকে আমরা বদলাবো—তার চেয়ে অনেক অনেক বড়ো! আমাদের চোখ তাকিয়ে থাকে চোখের দিকে।

একালের সমস্ত শূন্য তখন গুঞ্জন করে চলেছে ঃ ভালোবাসি।

বলি ঃ তুমি বলো।

সত্য স্বপ্ন আর কান্নায়

এ হল সেই একটা সময়ের কাহিনী যখন আমরা ঠিক ছোটো নই, ঠিক বড়ো নই। যখন আমরা কাটিয়ে উঠছি, হয়ে উঠছি। যখন আমরা জানি না, তবু জানি।

সব কিছু তখন ছায়া ছায়া, সব কিছু আশ্চর্য। অনেক আমরা দেখে ফেলেছি, তবু অনেক আমাদের অদেখা। সব কিছু তখন ভাঙা ভাঙা, আর সব কিছু তবু উন্মুখ।

তখন আমরা ঠিক ছোটো নই, ঠিক বড়ো নই।

এ হল সেই একটা সময়ের কাহিনী যখন ফুটবল খেলা শেষ হয়ে যাবার পর আমাদের সেই ছোটো শহরটার ছোটো নদীটার পাড়ে এসে আমরা বসতাম গোল হয়ে। আমরা সমবয়সী কয়েকজন। এপাড়া ওপাড়ার আমরা কয়েকজন। নদীর জলে ভাঙা ভাঙা ছায়া। আকাশের আঁচড়ে মিলিয়ে আসছে লাল। তখন নদীর জলে আমরা আপন মনে ঢিল ছুঁড়তাম একটার পর একটা। আর বলাবলি করতাম সাপের মাথায় সত্যি সত্যি মণি আছে কিনা। যদি থাকে সে মণি দেখতে কেমন, কতোখানি জায়গা তাতে ঝলমল করে উঠবে।

বলাবলি করতাম আর অবিশ্বাস করতাম আর আমি চেঁচাতাম, বাজে, বাজে। কিছু মানি না ওসব। কিছু না তাই কখনো হয়! আমি একটা বইয়ে পড়েছি, ওসব শুধুই বানানো, কল্পনা।

আর শণ্টুটা চিৎকার করে বলত, কেন হবে না। তুমি না দেখতে পারো, আমি না দেখতে পারি, নিশ্চয়ই কেউ দেখেছে।

আমি পাল্টা অন্য কিছু একটা বলতাম, অন্য কিছু একটা যুক্তি দিতাম। তারপর সবাই মিলে ফিস্‌ফিস্‌ করে উঠতাম, এই চুপ চুপ! ঐ ছ্যাখ কালকের সেই টিয়াটা এসেছে আবার!

তখন সবাই মিলে আমরা ছুটতাম সেই টিয়াটার পেছনে। হালকা সবুজ একটা পাখি কোথা থেকে উড়ে এসেছে কোথাকার এক শহরে। যদি কোনো রকমে ধরতে পারি ওটাকে। যদি কোনো রকমে বাঁধা পড়ে ওটা।

তারপর পাখির পেছনে ছুটে ছুটে আমরা যখন যে যার বাড়ি ফিরতাম তখন আবার বলাবলি করতাম, পাখিরা মানুষের ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারে কিনা।

নিত্যটা বলত, দূর, তাই কখনো পারে। সব বাজে কথা।

আমি চেঁচাতাম, কেন পারবে না? এক একজন লোক আছে যারা পাখির ভাষা বুঝতে পারে। তুমি আমি পারি না, কিন্তু সে-সব লোকে পারে। আমাদের কি হবে না হবে, কি বিপদ আসছে না আসছে পাখিরা সব আগে থেকে টের পায়। আগে থেকে জানিয়ে দেয়। যারা সে-সব ভাষা বোঝে তারা জানতে পারে······

আর তখন সন্ধ্যার আকাশ ছেয়ে দলে দলে সন্ধ্যার কাকগুলো উড়ে উড়ে যেত পাখা মেলে পশ্চিম থেকে আরো পশ্চিমে, একটা গাছ থেকে আরো দূরের একটা গাছে, নদীর এপার থেকে ওপারে।

আর আমরা নানা কথা বলাবলি করতাম, নানা কথা অবিশ্বাস করতাম আর তবু অপেক্ষা করতাম অসম্ভব কিছুর জন্যে, অপরূপ কিছু একটার আশায়।

আর মাঝে মাঝে আমরা গিয়ে জুটতাম শণ্টুদের বাড়ি। ওদের বাড়িতে ক্যারম ছিল। ক্যারম খেলতাম।

মস্ত বড়ো বাড়ি শণ্টুদের। মস্ত বনেদী বাড়ির ছেলে ও। বার বাড়ি, ভেতর বাড়ি, এ মহল, ও মহল, ঘরের পর ঘর। কিন্তু

শুধু ওদের বাড়িতেই ক্যারম ছিল, তাই লোভে লোভে এসে জুটতাম আমরা আর ক্যারম খেলতাম। আর চেঁচাতাম। আর দিব্যি গালতাম। আর চুরি করে ঘুঁটি সরিয়ে দিতাম। বেআইনী করে ষ্ট্রাইকার বসাতাম। আর সবাই মিলে কাড়াকাড়ি করতাম হলদে ষ্ট্রাইকারটার জন্যে।

শণ্টু বলত, এ্যই না, ওটা আমার ষ্ট্রাইকার। আমার পয়মন্তর আছে ওতে!

আমি চেঁচাতাম, পয়মন্তর না ছাই। চাই না তোর ষ্ট্রাইকার। পয় আবার কি। পয়মন্তর ফয়মন্তর কিচ্ছু মানি না আমি, কিচ্ছু মানি না! এমনিতেই তোকে দেখাচ্ছি দাঁড়া!

আর কালো খস্‌খসে ষ্ট্রাইকারটা টেনেই আমি খাবলা খাবলা পাউডারের মধ্যে ঘষে নিতাম, খাবলা খাবলা পাউডার ছড়াতাম চারদিকে, তারপর খেলা শুরু করার আগে মনে মনে যেন কপালে ঠেকিয়ে নিতাম ষ্ট্রাইকারটা। মনে মনে ঠেকালে কেউ দেখতে পাবে না। কেউ না।

আর খেলা জমতে না জমতে মাঝে মাঝে শণ্টুদের সেই বনেদী বাড়িটার মহলের পর মহল, ঘরের পর ঘর পার হয়ে ঠিক এসে দাঁড়াত মায়াদি। ঠিক টের পেয়ে যেত মায়াদি। ফরসা খালি পায়ে এদিক ওদিক ঘুরে ঠিক এসে বসত আমাদের পিঠ ঘেঁষে। বলত, আমি খেলব।

আমরা চেঁচাতাম, না মায়াদি, হবে না, হবে না এখন। গেম শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলবে না। এখন যা একখান শুরু হয়ে গেছে আমাদের, খবর্দার ডিসটার্ব করতে পারবে না তুমি।

তবু ঝোঁক ধরত মায়াদি। জেদ করত, হিংসুটেপনা করত, তারপর আচমকা আমাদের ঘুঁটিগুলো উলটুল করে দিয়ে জোর করে ভেঙে দিত খেলা। আমরা হাঁ হাঁ করে উঠতাম, কলরব শুরু করে দিতাম তুমুল। রাগে ঝাঁপিয়ে পড়তাম মায়াদির ওপর। চেঁচিয়ে

মেচিয়ে ঝাঁপিয়ে ধাক্‌কিয়ে গায়ের ঝাল মিটিয়ে শোধ তুলতাম মায়াদির ওপর। চিৎকার করে বলতাম, 'বেশ বসো, খেলতে পারো তো কচু! তিন বোর্ডে একখান নীল দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি দাঁড়াও!'

আমরা কেউ পার্টনার হতাম না মায়াদির। কেউ না। মায়াদি একা। আলুঢালু শাড়ি, আধখসা ব্লাউজ, এলোমেলো চুল, নাকে মুখে গায়ে আমাদের হাতের ফ্রেঞ্চ চকের বেপরোয়া ছাপ—মায়াদি খেলতে বসত একা। আর ঠেসে গেমের পর গেম দিয়ে আমরা হারিয়ে ভূত করে ছাড়তাম মায়াদিকে।

হেরে ভূত হয়ে মায়াদি যখন পালাত, তখন আমরা সবাই মিলে হাসতাম কলরব করে, অবজ্ঞায়। সত্যি এমন নিরেট মায়াদিটা, এমন বোকা, বোকার ডিম একেবারে। বয়সে তো আমাদের চেয়েও বড়ো, শণ্টুটার চাইতে দে-ড়-ব-ছ-র বড়ো। কিন্তু কি জানে ও, কি পারে! খেলতে এসেছে আমাদের সঙ্গে! পাল্লা দিতে এসেছে দ্যাখো না। কি পারে ও, কি জানে!

তারপর আমরা নানা কথা বলাবলি করতাম আবার। অদ্ভুত অপরূপ সব কথা। ক্যারম খেলার চেয়ে, ইশ্‌কুলের পড়ার চেয়েও বড়ো-বড়ো কঠিন-কঠিন অনেক, অনেক কথা। মায়াদিটার মগজে যা কখনো ঢুকবেই না, যা বোঝার ক্ষমতাই নেই মায়াদিটার।

আর যতো খবর সব যোগাড় করতাম আমরা। যতো উত্তেজনা সব। যোগাড় করতাম আর অবিশ্বাস করতাম আর অবাক হতাম আর পাল্লা দিতাম কে আগে শুনেছে, কে আগে বলতে পেরেছে।

মুহূর্তের মধ্যে আমাদের জানা হয়ে যেত, নিকিরি পাড়ায় যে সাপটা মারা পড়েছে তার চক্করের মধ্যে অসাধারণ কি দাগটা দেখতে পাওয়া গেছে।

আমরা বলাবলি করতাম, মধু শা'র মনিহারী দোকানে মোটা মোটা লাঠির মতো সেই অদ্ভুত পেনসিলগুলোর চালান আবার কবে আসবে।

এ শহরে নতুন-আসা যে• চাল্লুশ ছেলেটা তার বোনকে ব্যাকে চাপিয়ে সাইকেল চালিয়ে বেড়ায় তার সঙ্গে কার আলাপ হয়েছে আগে।

যতো খবর সব যোগাড় করতাম আমরা, যতো উত্তেজনা সব। আর সকলের চেয়ে, সব, সব কিছুর চেয়ে অপরূপ একটা খবর একদিন নিয়ে এল শণ্টুটাই। কথা বলতে বলতে বার বার সে এদিক ওদিক চাইলে। চোখের পাতা ফেললে ঘন ঘন। গলার স্বর ওঠালে নামালে। সবটা বোঝাতে না পেরে হঠাৎ থেমে ভঙ্গি করলে চাউনির। তারপর টেনে টেনে বললে, 'সা-ঙ্ঘা-তি-ক লোক! কি জানিস তোরা! ডেটিনিউ। এখন আছে নজরবন্দী হয়ে।

আর একেবারে অবাক হয়ে গেলাম আমরা। কেন না আমাদের এই ছোটো শহরটায় এ পর্যন্ত কোনো ডেটিনিউ দেখি নি আমরা। একজনকেও না। আর অবাক হয়ে চুপ করে রইলাম আমরা। বড়ো বড়ো জিনিসের সামনে মানুষ যেমন চুপ করে যায়। কেমন করে যেন আমরা জেনে গিয়েছিলাম, এবার বড়ো কিছু একটা আসছে আমাদের জীবনে, অপরূপ একটা কিছু।

আর পরদিন আমরা কেউ কাউকে জিগ্যেস করিনি, কেউ কাউকে জানাইনি! তবু একে একে সবাই গিয়ে আমরা হাজির হলাম শণ্টুদের বাড়ি। আরে তুই যে! নিত্যটা অবাক হয়ে গেল আমাকে দেখে। আর আমিও অবাক হয়ে গেলাম ছোট্কুকে দেখে, আরে ঐ ছ্যাখ ছোটকু, আর আমরা সবাই অবাক হয়ে গেলাম কালাকে দেখে, ছ্যাখ, ছ্যাখ কালাও এসেছে, কালা! সবাই এসে গেছি আমরা, সবাই, কিন্তু কেউ ক্যারম খেললাম না। তবু ঠিক টের পেয়ে মহলের পর মহল পেরিয়ে ফরসা খালি পায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল মায়াদি। কিন্তু ক্যারম ছুঁলামই না আমরা। আর অবজ্ঞায় দু'একবার তাকালাম মায়াদির দিকে। কি জানে মায়াদিটা! বয়সে একটু বড়ো হলেই বা কি হয়েছে! বড়ো বড়ো বিষয়, বড়ো বড়ো কথা কি বোঝে ও। ক্যারম

না খেলে আমরা সবাই মিলে ডাংগুলি খেলতে লাগলাম একটা ভারি সুন্দর মতো জায়গায়। আর সবাই বলাবলি করলাম, ঈস, কেন যে চোখে পড়েনি এতদিন। ডাংগুলি খেলার মতো এমন সুন্দর জায়গা আছে নাকি আর?

জায়গাটার একটু দূরেই সেই টিনের ঘরখানা, যেখানে সেই অন্তরীণ লোকটা এসে বাসা বেঁধেছে কয়েকদিন।

আর মনের সুখে আমরা ডাংগুলি খেলতে লাগলাম প্রাণ ভরে। কি সুন্দর জায়গা মাইরি! কি সুন্দর ডাংগুলি খেলার মতো জায়গা! কিন্তু ডাংগুলি আর খেললাম না আমরা। কালাটা বললে, চল ঐ গাছটাতে চাপি। আর আমরা সবাই বললাম, ঠিক বলেছিস, চল ঐ গাছটাতে চাপি। আর ছোটো নোনা আতার গাছটাতে আমরা সবাই মিলে চেপে বসে রইলাম এমনি এমনি। বসে বসে পা দোলাতে লাগলাম। তারপর সকলেই একসঙ্গে ফিস্‌ফিস্ করে উঠলাম,এ্যাই! এ্যাই!

সেই লোকটা: ডেটিনিউ। কালো দোহারা একটা মূর্তি। লম্বা লম্বা চুল, গায়ে গেঞ্জি। আমাদের দিকে না চেয়ে ঢুকে গেল বাড়ির মধ্যে। শন্টু বললে, সূর্য ডোবা পর্যন্ত বাইরে থাকতে পারবে। সূর্য ডুবলেই ঘরের মধ্যে।

আর সবাই আমরা অবাক হয়ে গেলাম। বড়ো কিছু একটা দেখার মতো করে আমরা দেখেছি, আর জানি, যা দেখছি তা বড়ো। আর সন্ধ্যে হয়ে গেলেও সেই নোনা গাছটার পলকা ডালপালায় বসে বসে পা দোলাতে লাগলাম আমরা কয়েকজন। সন্ধ্যার কাকগুলো সার বেঁধে ডানা মেলে উড়ে যেতে লাগল পশ্চিম থেকে আরো পশ্চিমে, এপার থেকে ওপারে।

আর তারপর থেকে আমরা সবাই বলতাম, না ভাই অনেকদিন ফুটবল খেলা হয় নি, চল খেলি গে। কিন্তু ফুটবল খেলা হত না কেমন, তার বদলে আমাদের ইচ্ছে হত নদীর পাড়টায় গিয়ে বসি।

তাও বসতাম না। শুধু সেই নোনা গাছটার ডালপালায় বসে বসে পা দোলাতাম আপন মনে। আর তাকিয়ে থাকতাম। আর ফিস্ ফিস্ করতাম, ঐ আসছে।

সেই আশ্চর্য লোকটা আসত যেত। সূর্য ডোবার আগেই এসে ঢুকত টিনের ঘরখানায়। আর একদিন, ঘরে ঢোকার আগে সোজা এসে দাঁড়াল আমাদের নোনা গাছটার কাছে। হেসে বললে, তোমরা অমন করে কি ছ্যাখো ভাই বলোতো। আমাকে?

এর ওর মুখের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করে আমরা চুপ করে রইলাম উত্তেজনায়।

আমার সঙ্গে ভাব করবে? কিন্তু আমি কে তা জানো তো?

উত্তেজনায় আমরা চাওয়া-চাওয়ি করলাম এর ওর মুখের দিকে তারপর সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম, জানি, নরেনদা!

নরেনদা হাসল। আর আমরা জানতাম অমন করে কেউ হাসতে পারে না। কেউ না। শুধু ডেটিনিউরা পারে। শুধু নরেনদা পারে। আর উত্তেজনায় মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম আমরা।

'এরই মধ্যে দাদা বানিয়ে ফেলেছো ভাই। আমি কিন্তু ভালো লোক নই বিশেষ। আমার ঘরে আসবে? বাড়িতে বকবে না তো?'

উত্তেজনায় এর ওর মুখের দিকে চাইলাম আমরা তারপর হুড়মুড় করে লাফ দিয়ে নেমে পড়লাম গাছ থেকে। হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লাম নরেনদার ঘরে। নরেনদার বই পত্তর, এ্যলার্ম ঘড়ি, মাখনের টিন, ডামবেল বারবেল সব কিছু দেখতে লাগলাম অবাক হয়ে। ফিস্‌ফিস্ করে প্রশংসা করে।

তারপর দল বেঁধে ফেরবার সময় আমরা বলাবলি করলাম ক্ষুদিরামের কথা। ক্ষুদিরাম বলেছিল, সে আবার ফিরে আসবে। আবার জন্ম নেবে। পাছে কেউ চিনতে না পারে সেইজন্যে তার গলায় জন্ম থেকেই থাকবে একটা ফাঁসির দাগ।

ছোটকু না কে বললে, কি জানিস তোরা। বিনয় বসুর গলায় ওই রকম একটা দাগ ছিল, তা জানিস? সেই বিনয় বসু যে রিভলবার হাতে রাইটার্স বিল্ডিং-এর মধ্যে ঢুকে গুলি করে মেরেছিল সায়েবদের।

এমনি নানা কথা আমরা বলাবলি করলাম। নানা কথা ভেবে ভেবে অবাক হয়ে গেলাম আমরা। তারপর শণ্টুদের বাড়িতে বসে অসহ্য উত্তেজনায় আমরা ভয়ে ভয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে একে ওকে জিগ্যেস করলাম, দেখেছিস?

দেখেছি। তুই?

হ্যাঁ, দেখেছি বোধ হয়। তুই!

দেখেছি! দেখেছি! আমাদের মনে হল, হ্যাঁ আমরা সকলেই যেন দেখেছি। নরেনদার গলার দিকে আমরা সকলেই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছি, একটা দাগ দেখা যাচ্ছিল না?

জন্মজন্মান্তর থেকে চিহ্ন করা অস্পষ্ট একটা ইশারা? কি মানে তার? কি?

আর তখনই অন্দরের ঘরের পর ঘর পেরিয়ে ঠিক এসে দাঁড়াল মায়াদি। আমাদের মনে হল মায়াদিকে বলব না। না, বলব না। মায়াদি বললে, ক্যারম খেলবি না? আমরা বললাম না। তারপর সমস্বরে বলতে লাগলাম নরেনদার কথা। কি বোঝে মায়াদিটা, কিচ্ছু না। তবু শুনুক। শুনে হাঁ হয়ে যাক একেবারে। কিন্তু একটুও যদি মাথায় কিছু থাকে মায়াদির। এ সব কথা একটুও যদি বোঝে। সব শুনেও মায়াদি জিগ্যেস করলে, ক্যারম খেলবি না?

না, না, না। আমরা চেঁচালাম সমস্বরে। কি জানো তুমি? কি জানো এ সব।

মায়াদি ঠোঁট উলটিয়ে ঠাট্টা করলে, ঈস্, ভারি তো কালোকুলো ঐ একটা লোক। দেখেছি, দেখেছি যা। আর কি নাম! নরেন! ছ্যা ছ্যা,—ঐ রকম নাম আজকাল রাখে নাকি কেউ? আহা কে?

না নরেনচন্দ্র! মায়াদি বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে বাঙালে বাঙালে করে উচ্চারণ করে নরেনচন্দ্র।

আমরা সমস্বরে চেঁচালাম, খবর্দার মায়াদি, খবর্দার বলছি! কি বোঝো তুমি?

কিন্তু ব্যঙ্গ করে তবু ভেঙাল মায়াদি—'আহা নরেনচন্দ্র!'

'কি বোঝো তুমি।'

'আহা কে? না নরেনচন্দ্র।'

মায়াদিটা বার বার ঐ একটা কথাই যতো বলে, ততো আমরা রাগি। আমাদের ইচ্ছে হয় মায়াদিকে কিছু একটা করি। সেদিন ক্যারম খেলার সময় ঘুঁটি উলটুল করতে এলে যা করেছিলাম। শাড়ি ব্লাউজ ছিঁড়েখুঁড়ে ফ্রেঞ্চ চক মাখিয়ে ভূত করে ছেড়ে দিই মায়াদিকে। আমাদের ইচ্ছে হয় আমরা সেদিনের চেয়েও বেশি করে করি। কিন্তু করি না আমরা। মায়াদিটা বড়ো হয়ে গেছে। আমরা বড়ো হয়ে উঠছি। ও রকম করা ভালো না। তবু এমন ইচ্ছে করে আমাদের।

আর না পেরে মায়াদি চলে গেলে আমরা হাসলাম অবজ্ঞায়, সত্যি, কি বোঝে মায়াদিটা! কতো বড়ো বড়ো কথা আছে পৃথিবীতে, কতো অপরূপ আশ্চর্য এক-একটা আদর্শ—তা বোঝার ক্ষমতা থাকলে তো। তার চেয়ে শাড়ি পরুক, গয়না পরুক, গিন্নীপনা করুক গে মায়াদি। এ সব কথায় যেন না আসে কিছুতে।

আর আমরা যা ভাবতাম, তাই ভাবত আমাদের ছোটো শহরটার সকলে, সকলে। যারা ঘর-সংসার করে, চাকরি করে বাজার করে, সকলে। সকলেই বলত, সত্যি ছেলে হলে অমনি হওয়া উচিত। কিন্তু সে তো সকলে হয় না। তেমন পুণ্য কি আর আমাদের মতো সাধারণ লোকের আছে। ওরকম ছেলে জন্মায় কোটিতে গোটিক। ওরা মানুষ নয় গো, মানুষ নয়, দেবতা।

আর শণ্টুর বাবাটা পর্যন্ত ঐ কথা বলত, 'আমরা পারি না। ওরা পারে ওরা অন্য এক ধাতুতে তৈরি। তোদের নরেনদাকে নেমন্তন্ন করে আয় না একদিন। আর তো কিছু পারব না, যারা মহৎ তাদের দর্শন করেও পুণ্য……'

আর আমরা বলাবলি করতাম, দেবতা মানে কি।

ছোটকুটা বলত, 'যতো বাজে কথা, দেবতা! দেবতা আবার কি। সবাই মানুষ। নরেনদাও।'

নিত্যটা বলত, 'তা বলা যায় না। কি জানিস তোরা। তবে কেন এক একজন লোক এমন থাকে যে হাজার চেষ্টা করেও কেউ তার মতো হতে পারে না? কেন বল দেখি। স্বর্গে থাকলেই কি আর দেবতা হয়? মানুষের মধ্যেও এক একজন থাকে, এক একজন জন্মায় যারা মানুষ নয়।

আর আমরা সবাই সবার কথার প্রতিবাদ করে বলতাম, না—না। ও না, ওরকম না। তারপর সবাই মিলে বলাবলি করতাম, আচ্ছা নরেনদাকে গিয়ে ধরলে কেমন হয়। যদি বলি, লাঠিটা সেই রকম ভাবে একবার ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিন না নরেন দা। ঈস্, বন্‌বন্ করে লাঠি ঘোরাচ্ছে নরেনদা—পেছু পেছু পুলিস সাহেব ছুটে আসছে গুলি করতে করতে। কিন্তু একটা গুলিও লাগছে না নরেনদার গায়ে। লাঠি ঘুরিয়ে সব গুলি আটকে ফেলছেন নরেন দা। সেই রকম?

কিন্তু আমাদের কথা শুনে নরেনদা হাসতেন অন্যমনস্কের মতো। বলতেন, তোরা ভারি ছেলেমানুষ। তাই আমরা আর লাঠি ঘোরাতে বলি নি, নরেনদাকে। লাঠি দিয়ে বন্দুকের গুলি ঠেকানো আমাদের দেখা হয়ে ওঠে নি। তার বদলে নরেনদার হাসি দেখে অবাক হয়ে যেতাম আমরা, আচ্ছন্ন হয়ে যেতাম। নরেনদা সামনে থেকে সরে গেলে বলাবলি করতাম, দেখেছিস?

দেখেছি, দেখেছি।

কিন্তু কি মানে ঐ হাসির! কি মানে!

আমাদের মনে হত অমন করে কাউকে হাসতে দেখিনি। কাউকে না। সারা জীবনে না।

আর আমরা বলাবলি করতাম অপূর্ব অপরূপ কতো জিনিসের। অপূর্ব অপরূপ কতো আদর্শের। এমন একটা বিস্ময় আছে যার নাম মহান। এমন একটা আবির্ভাব আছে যার নাম অসাধারণ।

আর আমাদের যা জানা ছিল তাই আমরা জানাতাম পরস্পরকে। আমরা মনে মনে গড়ে তুলতাম একটা মূর্তি যা আমরা গড়তে চাই, দেখতে চাই। তার গলায় মহত্ত্বের অস্পষ্ট দাগ। জন্মজন্মান্তরের মধ্যে দিয়ে সে পৃথক হয়ে আছে আগে থেকে। সাধারণ কিন্তু সে সাধারণ নয়। মানুষ কিন্তু সে মানুষ নয়। সে মরে কেননা মহত্ত্বের মূল্য মৃত্যুতে। কারো জন্যে দয়া নেই তার, কারো জন্যে মায়া নেই। কেননা সে এগুবে, সে এগিয়ে। সুখ নেই তার, স্বভাব নেই, দারাপুত্র পরিবার নেই—সে একক সিদ্ধার্থ, সে একক চৈতন্য।

মনে মনে আমরা গড়ে তুলতাম এক অপরূপ মূর্তি, আর গড়ে ওঠা সে মূর্তিকে দেখে অবাক হয়ে যেতাম নিজেরাও। আর যতো অবাক হতাম ততো তীব্র, তীব্রভাবে ভালোবাসতাম সেই মূর্তিকে।

আর নরেনদা যখন হেসে চলে যেতেন আমাদের সামনে থেকে তখন নরেনদার একটা কোনো গুণের কথা আমরা বলাবলি করতাম আর বিমূঢ় হয়ে যেতাম ভেবে ভেবে। আর তা দেখে হিংসেয় জ্বলে যেত শণ্টুটা। সেও অন্য একটা গুণের কথা বলত আরো জোর দিয়ে, আরো ভালো করে। আর হিংসেয় জ্বলে যেতাম আমি। আর শণ্টুর চেয়েও বেশি করে, অনেক অনেক ভালো করে নরেনদার অন্য আর একটা গুণের কথা আমি শোনাতাম সবাইকে। সবাই আমাদের সায় দিত। শহরের সকলে। শণ্টুটার বাবা থেকে শুরু করে সকলে।

শুধু মায়াদিটা জেদীর মতো মাথা ঝাঁকিয়ে বলত, 'বাব্‌বা, হয়েছে! না বাপু অমন দেবতা দিয়ে কাজ নেই আমার!'

আর অবজ্ঞায় তাচ্ছিল্যে হাসতাম আমরা, 'কি বোঝে মায়াদিটা। এ সব আদর্শ ওর মাথায় ঢুকলে তো! এমন নিরেট বোকা মায়াদিটা। বোকার ডিম একেবারে।'

এমনি করে কাটিয়ে উঠছিলাম আমরা। এমনি করে বড়ো হয়ে উঠছিলাম। আর সকাল বেলায় ঘুম ভেঙে উঠে অবাক লাগত আরো অনেক সন্ধ্যার কথা ভেবে। আর সন্ধ্যায় নদীর পাড়ে বসে অবাক লাগত আরো অনেক অনেক সকাল বেলার কথা ভেবে। আর সূর্য ডুবে গেলেও দিন শেষের সচকিত কাকের দল নিঃশব্দ পাখা মেলে উড়ে যেতে চাইত কেবলি সূর্যের দিকে, পশ্চিম থেকে আরো পশ্চিমে, নদীর এপার থেকে ওপারে।

আর মাথায় লম্বা হয়ে উঠছিলাম আমরা। প্রায় দাদা-কাকাদের মতন লম্বা। প্রায় অন্য লোকদের মতন লম্বা। আমরা বড়ো হয়ে উঠছিলাম। আর কেমন যেন হয়ে উঠছিল শণ্টুটা। মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে যেত। বিনা কারণে রেগে রেগে উঠত। আর আমরা যখন নরেনদার কথা বলাবলি করতাম, ও সরে সরে যেত। তাই আমরা বলাবলি করলাম, কি যেন হয়েছে শণ্টুটার!

আর আমি জোর করে একদিন চেপে ধরলাম শণ্টুকে, 'কি হয়েছে তোর, বল্। কি হয়েছে তোর?'

শণ্টুটা রেগে রেগে উঠতে চাইল। আর আমার চেয়েও লম্বা হয়ে উঠছে শণ্টুটা। শণ্টুটা রেগে রেগে উঠতে চাইল, এ সব কথা কেন জিগ্যেস করতে এসেছিস তোরা। কি বুঝিস তোরা, কি বুঝিস! ছেড়ে দে আমাকে! আর কেমন কান্না কান্না হয়ে গেল শণ্টুটার গলার আওয়াজ। আমার হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে গেল শণ্টুটা। আমরা বলাবলি করলাম, কি হয়েছে শণ্টুটার।

তারপর শণ্টুটা একদিন আমাকে ডাকলে, আয়।

আমার দিকে কিছুতেই তাকাচ্ছিল না শণ্টুটা। আমাকে বললে,

আয়। কান্না-কান্না ভাঙা-ভাঙা গলায় শণ্টুটা আর কিছুই বললে না। আমরা জানতাম কি যেন হয়েছে শণ্টুটার। তাই শণ্টুটার সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম আমি। হেঁটে হেঁটে আমরা গিয়ে বসলাম সেই ঢিবিটার ওপর। শণ্টুদের বাড়ির পেছন দিকে যে ঢিবিটা আছে সেইখানে। আর কিছুতেই আমার দিকে চাইছিল না শণ্টুটা। কথা বলতে পারছিল না। আমিও চাইলাম না শণ্টুর দিকে। একটা কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগলাম এখানে ওখানে। মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে খোলামকুচি বার করতে লাগলাম। তারপর এক একটা খোলামকুচি ছুঁড়তে লাগলাম দূরে—দূরে।

শণ্টু ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে, চুপ!

চমকে তাকালাম আমি। ঢিবিটার পাশ থেকে শণ্টুদের বাড়ির খিড়কির দিকটা চোখে পড়ে সব। খিড়কির একটু দূরে একটা ঝাউ। ঝাউ গাছটার তলায় চুপ করে এসে বসে আছে মায়াদি। বসে বসে আঁচলের খুঁট জড়াচ্ছে নখে। এদিক ওদিক চাইছে মাঝে মাঝে। ঢিবিটার আড়ালে আমরা। আমাদের দেখতে পাচ্ছে না মায়াদি।

তারপরে আরো আরো চমকে উঠলাম আমরা। নরেনদা! নরেনদাও কোথা থেকে এসে দাঁড়িয়েছে ওই ঝাউ গাছটার নিচে। আবছা ছায়ায় নরেনদা কি বলছে মায়াদিকে। মায়াদির গা ঘেঁষে বসে পড়ছে নরেনদা। ঠোঁট নড়ছে ওদের। কি রকম অদ্ভুত করে হাসছে মায়াদি। ওদের মুখ দুটো সরে এসেছে কাছাকাছি। সরে আসছে আরো কাছে, আরো……

নিঃশ্বাস বন্ধ করে আমি দেখছি। কেবলি দেখছি। কেবলি দেখছি। আর কাঁদতে চাইছি আমি। বাচ্চাদের মতো ককিয়ে উঠতে চাইছি আমি। কিন্তু কাঁদতে পারছি না। নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। শুধু সারা শরীর শক্ত হয়ে উঠছে আমার। আঙুলগুলো শক্ত হয়ে উঠছে। আর শণ্টুর গায়ে হাত দিয়ে শণ্টুকে কি বলতে চাইছি আমি কিন্তু বলতে পারছি না। আর চুপি চুপি ওখান থেকে সরে যখন

পালিয়ে এলাম আমরা তখন শণ্টুটার গায়ের মাংসের মধ্যে গর্ত গর্ত হয়ে উঠেছে। আমার আঙুলগুলো শক্ত শক্ত হয়ে কখন বিঁধে বিঁধে গিয়েছে ওর গায়ের মধ্যে। আমার নখের ডগায় চিকচিক করছে রক্ত।

আমরা পালিয়ে গেলাম।

আর তারপর আমরা যখনই সেই গড়ে তোলা অপরূপ মূর্তিটার কথা ভাবতে যেতাম, তখন কিছুতেই আর সে মূর্তিটা দেখতে পেতাম না আমরা। শুধু বীভৎস বীভৎস কি একটা ভেসে উঠত চোখের সামনে। আর আমরা জানতাম সেটা পাপ—পাপ! আর ককিয়ে উঠতে চাইতাম আমরা, কিন্তু কিছুতেই কাঁদতে পারতাম না।

শুধু ফিস্‌ফিস্ করে অন্য কি সব কথা বলাবলি করতাম আমরা। আর ফিস্‌ফিস্ করে অন্য কি একটা কানাকানি চলছিল শণ্টুদের বনেদী বাড়ির এক মহল থেকে আর এক মহলে, আমাদের ছোটো শহরটার এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায়। তারপর শণ্টুর বাবা একদিন উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললে, 'দেবতার মতো মাথায় করে রেখেছিলাম আমরা, অথচ এতখানি জঘন্য···

ফিস্‌ফিস্ করে কানাকানি চলছিল ছোটো শহরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত।

তারপর শণ্টুদের বাড়ির সরকার একদিন এসে বললে, আজ অর্ডার হয়ে গেল। বলেছিলুম পাড়ার জনকয়েক মাতব্বর লোক থানায় দরখাস্ত দিলেই ত্বদিনে বদলি করে দেবে এখন। আজ অর্ডার এসে গেছে। চলে যাচ্ছ লোকটা। নৌকায় মালপত্তর তুলছে।

তাই দল বেঁধে আমরা গিয়ে দাঁড়ালাম নৌকার ঘাটে। আমরা সমবয়সী কয়েকজন। আমরা এপাড়া-ওপাড়ার কয়েকজন। আমরা যারা সবে বড়ো হয়ে উঠছি, সবে লম্বা হয়ে উঠছি মাথায়। দল

বেঁধে আমরা দাঁড়ালাম কিন্তু কাছে গেলাম না। দেখতে লাগলাম দূর থেকে। সব মাল উঠে গেছে। সব মাল উঠে গেছে, তবু নৌকায় উঠছে না নরেনদা। দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। কি যেন বলতে চাইছে আমাদের। তাই আরো পিছিয়ে গেলাম আমরা। পিছিয়ে পিছিয়ে গিয়ে উদগ্রীব হয়ে রইলাম। একটা মূর্তি দেখতে চাইছিলাম আমরা, কিন্তু কিছুতেই দেখতে পাচ্ছিলাম না আর।

আর নরেনদা অপ্রতিভের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। কি যেন বললেন আমাদের দিকে চেয়ে। তারপর নৌকায় না চেপে ধীরে ধীরে হেঁটে আসতে লাগলেন কোথায়? কোথায়?

চমকে উঠলাম আমরা! শণ্টুদের বাড়ি। নরেনদা ধীরে ধীরে এসে দাঁড়িয়েছেন একেবারে বাড়ির ফটকের ভেতরে, একেবারে আঙিনার মধ্যে। আর দল বেঁধে আমরা ছুটতে ছুটতে এলাম নরেনদার পেছু পেছু।

আঙিনায় একটু ইতস্তত করে নরেনদা যেন বাড়ির লোকদের উদ্দেশ্যেই বললেন, 'চলে যাচ্ছি। যাবার আগে মায়ার সঙ্গে একবার দেখা করে যেতে চাই।'

কেউ উত্তর দিলে না। শুধু দোতলার জানালাটা দড়াম করে খুলে গিয়ে ভেসে উঠল একটা বিহ্বল নির্বোধ মুখ—মায়াদি।

তারপর কি যেন হল একটা। কি যেন একটা পেয়ে বসল আমাদের। মহলের পর মহল পেরিয়ে শণ্টুর বাবা এসে দাঁড়াল আঙিনায়। বুঝি বললে, 'আশ্চর্য স্পর্ধা তোমার। এখুনি বেরিয়ে যাও ঘর থেকে, এখুনি!' আর কি যেন হল। ককিয়ে উঠতে চাইছিলাম আমরা। কিন্তু কাঁদলাম না। একসঙ্গে দল বেঁধে চেঁচাতে লাগলাম আমরা, শালা লুচ্চা! লুচ্চা শালার সাহস তো কম নয়। শালা ঠকিয়েছে আমাদের। শালাকে মাথায় করে রেখেছিলাম, শালা ঠকিয়েছে, সর্বনাশ করে ছেড়ে দিয়েছে আমাদের। চেঁচাতে চেঁচাতে

হঠাৎ ক্ষেপে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল শণ্টুটা—এলোপাথাড়ি ঘুষি দিয়ে টান মেরে জামাটা ছিঁড়ে দিলে নরেনদার। হাঁপাতে লাগল, চেঁচাতে লাগল চিলের মতো। আর কোথা থেকে একটা থ্যাবড়া ইটের চাংড়া ছুঁড়ে মারল নিত্য। নরেনদার কালো হালকা সারাটা মুখ ভরে গেল ইটের দাগে, রক্তে। আর তুই-তোকারি করে চেঁচাতে লাগলাম আমরা। চেঁচাতে লাগলাম অশ্রাব্য গালাগালি দিয়ে। ধাক্কা দিতে দিতে নরেনদাকে উল্টে ফেলে দিলাম আমরা। তার জামা কাপড় টেনে টেনে ছিঁড়ছিলাম। চিলের মতো চেঁচাতে চেঁচাতে আমরা এক বালতি কাদা এনে ঢেলে দিলাম নরেনদার মাথায়। লাথি মেরে মেরে নরেনদাকে দাঁড় করালাম আমরা। প্রতিহিংসায়, জ্বালায়, উত্তেজনায় চিলের মতো চেঁচাতে লাগলাম আমরা—দেখে নাও মায়াদি। চোখ ভরে একবার দেখে নাও শালাকে। তোমার দেবতার দিকে একবার তাকিয়ে দেখো······

চেঁচাতে লাগলাম আর লাথি দিতে খোঁচা দিতে লাগলাম নরেনদাকে আর আমাদের মনে পড়ল তর্কে না পেরে মায়াদি বলেছিল, না বাপু অমন দেবতায় আমার কাজ নেই। সে কথা মনে পড়ে হতভম্ব লাগছিল আমাদের। কান্না-কান্না লাগছিল। তাই আরো জোরে, আরো আরো জোরে চেঁচাতে লাগলাম আমরা, দেখো মায়াদি, তোমার দেবতার আসল চেহারা। দেখো দেখো! আর ধাক্কা দিতে দিতে, লাথি মারতে মারতে আমরা নরেনদাকে ঠেলে নিয়ে চললাম ঘাটের দিকে। ঠেলে তুলে দিলাম নৌকায়।

নৌকা ছেড়ে দিলে। চলন্ত নৌকার ওপর থেকে নরেনদা কেমন অদ্ভুতভাবে চেয়েছিল আমাদের দিকে। কি যেন বলতে চাইছিল। কিন্তু কিছুই শুনতে চাই না আমরা, কিছু না। ধুলো-কাদা রক্তমাখা লাঞ্ছিত মূর্তিটাকে যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ চিলের মতো চেঁচালাম আমরা। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ভেঙে গেল আমাদের। ভেঙে ভেঙে গেল বিশ্রীভাবে। তখন হঠাৎ চুপ করে

গেলাম সবাই। ককিয়ে উঠতে চাইছিলাম আমরা—কিন্তু কাঁদলাম না। কি একটা বলতে চাইছিলাম পরস্পরকে। বলতে পারলাম না। হঠাৎ পরস্পরের কাছ থেকে পালাতে চাইলাম আমরা। নিঃশব্দে, প্রেতের মতো, কারো দিকে না চেয়ে। আর ককিয়ে উঠতে চাইছিলাম আমরা। কিন্তু ককিয়ে উঠতে পারছিলাম না কিছুতেই।

আর তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছিল। শহরের কাকগুলো পাখা মেলে নিঃশব্দে উড়ে যাচ্ছিল পশ্চিম থেকে আরো পশ্চিমে, এপার থেকে ওপারে, সূর্যের দিকে।

শণ্টুদের বাড়ির কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ালাম আমরা।

সারা বাড়ি অন্ধকার। দোতলায় স্তব্ধ একটু ভিড়। উঠোনের মধ্যে একলা এক বীভৎস প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে শণ্টুর বাবা। ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, 'বোকা মেয়েটা···'

বোকা, বোকা মায়াদিটা, বোকার ডিম। ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল মায়াদিকে। বন্ধ ঘরের মধ্যেই কাপড়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরেছে মায়াদিটা।

আর এ হল সেই একটা সময়ের কাহিনী যখন আমরা ঠিক ছোটো নই, ঠিক বড়ো নই, যখন আমরা একটা স্বপ্ন থেকে বেড়ে উঠি আর একটা স্বপ্নে, একটা সত্য থেকে আর একটা সত্যে, একটা কান্না পার হয়ে আর একটা কান্নায়। যখন সত্য স্বপ্ন আর কান্নায় আমরা সামনে হাঁটি। আমরা হাঁটি।

ছবি

হাতে একটা ক্যামেরা এসেছে। তাই পকেটে পয়সা থাকলেই ছুটি ফোটোর দোকানে। কয়টা একস্‌পোজার টিকল তা পরখ করি উৎসাহের সঙ্গে। তর্ক করি বন্ধুদের সঙ্গে। অপেক্ষা করি অনুরোধের জন্য। কেউ অনুরোধ করলেই হল। অমনি তাকে দাঁড় করিয়ে একবার এদিক তাকাতে বলি, একবার অন্যদিকে। নিজে চলে যাই কখনো দূরে, কখনো কাছে। ক্যামেরায় চোখ লাগিয়ে কোণ নিই কখনো নিচু থেকে, কখনো উঁচু থেকে, কখনো কোনাচে-ভাবে।

কিছুদিন বাদেই দেখা গেল পরিচিত সকলের কাছেই দাম আমার বেড়ে গেছে। পিসিমা তাঁর অনুঢ়া মেয়েকে দাঁড় করিয়ে দেন,ছবি চাই বিয়ের জন্য। দিদি তার চারবছরের বাচ্চার চুল আঁচড়িয়ে, পাউডার ছিটিয়ে, বাবু সাজিয়ে এগিয়ে দেন। বন্ধু-বান্ধব, ভাইয়ের বন্ধু, পাড়ার ছেলে প্রভৃতি তরুণ দলের তো কথাই নেই। নতুন নতুন আইডিয়া আসছে দমকে দমকে। নতুন নতুন পোজ উদ্ভাবনের চেষ্টায় ভয়ানক কায়দা করে তাকিয়ে, না তাকিয়ে, দাঁড়িয়ে, হেলান দিয়ে, বসে, আধা বসে, আধা শুয়ে অপেক্ষা করে ক্লিকের জন্যে।

তাতে অবিশ্যি আমার আপত্তি নেই। সাধ্যমতো সকলের শখই পুরোই আর সবচেয়ে বেশি করে পুরোই আমার নিজের শখ। বাড়ির প্রত্যেকটি লোকের, প্রত্যেকটি পরিচিতের, এমন কি টিয়া বেড়াল প্রমুখ প্রত্যেকটি প্রাণীর এবং কার্নিস, রেলিঙ, তুলসীগাছ প্রমুখ প্রত্যেকটি আকৃতির একাধিক ছবি তোলা হয়ে গেলেও অনুরোধ

কিংবা খেয়াল হওয়া মাত্র আরো একটি ছবি তোলার সুযোগ সহজে ছাড়তাম না।

মা বললে, হয়েছে! পরিচিত কিছুই তো আর বাদ রইল না দেখছি। এর পর কি করবি?

কিন্তু বাদ ছিল। এবং বাড়ির নিতান্ত পরিচিতদেরই মধ্যে। খেয়াল ছিল না। খেয়াল হল যখন শেষ পর্যন্ত আমাদের বাড়ির জমাদার নিজে থেকেই এগিয়ে এল—

'নমস্কার বাবু!'

জমাদারের ঐ একটা অভ্যেস। কেমন একটা নেশাচ্ছন্ন নির্বাক ভঙ্গিতে ও দৈনিক ঝাড়ু দিয়ে যায় বাড়িতে। বাড়ির পুরুষদের সঙ্গে কথা বিশেষ বলে না। কখনো কিছু বলার প্রয়োজন হলে নেশা-গ্রস্তের মতোই একটু অতিরিক্ত মনোযোগ দিয়ে দীর্ঘ একটা নমস্কার করে আগে।

হেসে বললাম, 'নমস্কার। কি জমাদার খবর কি?'

'আর আমাদের খবর বাবু! না কি বলছেন! তবে ঐ জমাদারণী বলছিল……'

জমাদারণী মানে জমাদারের বৌ।

'কি বলছিল?'

'আর বাবু উ জমাদারণীর কথা। তবে হাঁ, বলছিল কি কোন দিন মরে ধরে যাবো। একটা ফোটোক থাকলে আমনার ঘরে ঝুলিয়ে রাখা বি চলবে। বেটা বিটিরা বলবে কি হাঁ এইটা আমাদের বাপ ছিল……খানিক মনে হবে, নাকি বলছেন বাবু? কোনদিন মরে ধরে যাবো……'

সত্যিই লজ্জা হল। এত লোকের ছবি তুলছি অথচ চোখের সামনে রোজ জমাদারকে দেখি, কোনোদিন তা একটা ছবি তোলার কথা মনে হল না। কোনো দিন চোখেই পড়ল না। লোকটা নিজে থেকে যেচে না বললে হয়ত……।

বললাম 'বেশ তো। দাঁড়াও উঠোনে, ক্যামেরাটা নিয়ে আসি—!'

জমাদার লুব্ধ ও কৃতার্থের মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ক্যামেরার দিকে। চোখ মিটমিট করলে বোকার মতো, তারপর হঠাৎ সরে এল, লজ্জিতভাবে, 'এখনই তুলবেন বাবু?'

'হ্যাঁ এখনি। ফিল্ম যখন আছে তখন হয়ে যাক। নয়ত আবার পরে ভুলে যাবো—'

'আজ্ঞে হাঁ তা তুলবেন বই কি। আপনি বলেছেন একটা কথা। সে আমনাদের······তবে বলছিলাম কি আজই-ই তুলবেন?'

'হ্যাঁ আজই যেমন আছ যেমনি—'

'এ সব উঠে যাবে বিলকুল। নাকি বলছেন? ই ঝাড়ু, টিন সব উঠে যাবে?'

'হাঁ—'

কিন্তু হঠাৎ খানিকটা হকচকিয়ে গেল জমাদার।

'বলছিলাম কি, জমাদারণীকে একটা কথা বলি। আমনি যে কালে বলেছে কি হাঁ জমাদারের ফোটোক তুলে দিব, তখন······ আজ থাক। নাকি বলছেন? সে না হয় আর একদিন আমনাকে······'

যে শখটা গোপন লজ্জিত হঠাৎ সে শখটার বাস্তব চেহারার সামনে দাঁড়াতে হলে হয়ত অমনি বিব্রত হয়ে উঠতে হয় সবাইকে। জমাদার নিজে থেকে পেছিয়ে গেল ক্যামেরাটার সামনে থেকে। আপন মনে ঝাড়ু দিতে শুরু করলে। ঝাড়ু দিতে দিতেই আপন মনেই বিড়বিড় করলে 'সে আর একদিন হবে নাকি বলছেন বাবু········'

ক্যামেরা গুটিয়ে রেখে দিলাম। অবাক লেগেছিল খানিকটা। জমাদার লোকটা অমনি খাপছাড়াই বটে। অথবা কে জানে, যারা চোখে পড়ার মতো নয়, তাদের ওপর দৈবাৎ চোখ পড়লে বোধ হয়

খাপছাড়াই লাগে কিংবা যারা খাপছাড়া হলেও চোখে পড়ার মতো নয়, আমাদের বাড়ির জমাদার তাদেরই একজন। প্রৌঢ় রোগা নির্বিকার নেশাচ্ছন্ন একটা লোক। কলকাতার জমাদার হলেও জাতে সে বাঙালী। বাড়ি ছিল হুগলীর কোন একটা গ্রামে, দু তিন পুরুষ আগে। কিন্তু কথা না বললে বাঙালী বলে তাকে চেনা বেশ কঠিন। খালিগায়ে খালিপায়ে একটা টিন আর ঝাড়ু নিয়ে সে দেখা দেয় প্রত্যহ। কখন আসে কখন যায় কেউ বিশেষ নজর করে না। নজর করার প্রয়োজন হয় না। লোকটা নেশাই করুক আর যাই করুক ঝাড়ু দেয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। নোংরা জিনিস সম্পর্কে মনে একটা ঘৃণা থাকলে কেউ অত খুঁতখুঁতানি নিয়ে নিবিষ্ট মনে ড্রেনের মুখ আর পায়খানার চাতাল পরিষ্কার করতে পারে না। তাই কেউ লক্ষ্য করে না ওকে। শুধু নজর পড়ে যখন ও নিজেই চেঁচিয়ে ডাকে—'হা হা হা—খোঁকাটো মাটি হতে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। আমনারা নিজেদের ছেলেকেও নজর নেন না মা—এ্যাই খোকা, খেয়োনা রোগ হবে। ই কলকাতা বড়ো খারাপ জায়গা আছে—খায় না অমন। রোগ ভোগ হয়ে যাবে মা……'

কখনো কখনো থমকে দাঁড়াত, 'কাপড় মেলে দিয়েছেন মা। তুলে লিন। ঘুরতে ফিরতে ছোঁয়া লাগবে কি ঝাড়ু ময়লা লাগবে। আপনারা……কি বলা যাবে……'

তখন জমাদারের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হত বাড়ির লোকে। তারপর ময়লা থেকে বাড়ির ছোটো ছেলেটাকে তুলে এনে, কিংবা মেলে দেওয়া কাপড় গুটিয়ে রেখে পর মুহূর্তেই ভুলে যেত অনায়াসে।

স্বভাবতই জমাদারের কথা, আর জমাদারের ফোটো তোলার কথা আমিও ভুলে গিয়েছিলাম আবার। বড়ো বড়ো ঘটনা যা অনবরত ঘটে যাচ্ছে, তার ঘূর্ণিতে জমাদারের কথাটা মনে করে রাখাই হয়ত কঠিন।

জমাদারই নিজে থেকে মনে করিয়ে দিলে আবার, নমস্কার বাবু।

নমস্কার করাটা জমাদারের বাঙালীত্বের একটা লক্ষণ। সে যে নিতান্ত অবাঙালী মেথর ঝাড়ুদার ক্লাসের একটা লোক নয় তার চিহ্ন।

'নমস্কার জমাদার। কি মনে করে?'

'আর বাবু জমাদারের আবার খবর। তবে ঐ আমার খোকাটা—ভগবানের দয়ায় তো বেশ বড়োসড়ো হয়ে উঠছে, নাকি বলছেন বাবু। তাই, আপনি সেদিন বলেছিলেন—

জমাদারের নেশাচ্ছন্ন টলটলে-অথচ লাজুক লাজুক চোখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকেও ঠাহর হল না, কি বলেছিলাম। হঠাৎ মনে হল, 'ও হো সেই ফোটো?'

'আর বলেন কেন। জমাদারণী বলছে, কি বাবু যখন বলেছে ঐ একটা শখ আর কি বাবু। নাকি বলছেন?'

যারা আশেপাশে ছিল, তাদের কেউ কেউ হেসে উঠল সহানুভূতিতে অথবা মজায়। কেন না জমাদারের আবার এক জমাদারণী আছে, আর তাদের আবার ফোটো তোলার মতো একটা খাপছাড়া শখ হতে পারে, আর সে শখ তারা এত মাস পরেও ভোলেনি, এটা সহানুভূতি এবং মজার কথা বইকি।

খানিকটা অপরাধীর মতো স্বীকার করতে হল, 'সত্যি ভুলে গিয়েছিলাম। বেশ, কখন তুলবে? এখন?'

জমাদার সেই প্রথম দিনকার মতোই বিব্রত হয়ে উঠল আবার, 'এখন? আচ্ছা সে হবে নাকি বলছেন' বলে হকচকিয়ে ঝাড়ু দিয়ে ঝাঁট দিতে শুরু করল দৈনন্দিনের মতো।

ক্যামেরাটা নিয়ে জমাদারকে বললাম, 'দাঁড়াও আজই হয়ে যাক, নইলে আবার ভুলে যাবো—'

জমাদার কিন্তু কিছুতেই ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালো না। কেন তা বলতে লজ্জা পাচ্ছিল বোধ হয়, জেরার চোটে শেষ পর্যন্ত বলেই

ফেললে, 'বলছি কি, শুধু আমার ফোটোকটা লিবেন বাবু, কিন্তু জমাদারণী বলছিল তবে মেয়ে মানুষের কথা নাকি বলছেন বাবু।...... কিন্তক ওই যেকাল বলছিল......'

কিছুক্ষণ চেষ্টা করে তবে বুঝতে পারা গেল যে জমাদারের মানসিক ইচ্ছেটা হল শুধু তার ছবি নয়, একই সঙ্গে জমাদারণী আর খোঁকা আর বড় খোকা সবারই ছবি তোলা।

'নাকি বলছেন বাবু, খোঁকা কি বলবে কি হাঁ এইটা আমার বাপ ছিল। এইটা মা ছিল, উরা কত দুখ তকলিফ করে মানুষ করেছে। আমরা বি দেখব—কি হাঁ ছুটুতে খোঁকাটা কি রকম ছিল এই আর কি বাবু। জমাদারণীর......'

বললাম, 'বেশতো তোমাদের সকলেরই না হয় তোলা যাবে। কিন্তু কি করে তুলবে ? নিয়ে আসবে সবাইকে এখানে ?'

জমাদার কৃতার্থ হয়ে বললে, 'আজ্ঞে হাঁ বাবু। আপনি বললে সে আর......সে লিয়ে আসব একদিন—'

বললাম, 'আচ্ছা থাক, নিয়ে আসতে হবে না। আমিই যাবো। বিকেলে ? তখন কাজ থাকবে না ? বেশ.......'

ঠিকানাটা নিয়ে রেখে দিলাম। এবার শখটা আমার। ওদের বাড়িতে গিয়েই ছবি তুলব। করতে পারলে নতুন ধরনের একটা শট হিসেবে জিনিসটা মন্দ হবে না। মনে মনে আঁচ করে রাখলাম কি ভাবে তুলতে হবে। নামকরা এক বিদেশী আলোকচিত্রের একটা ছবি মনে মনে ফিরছিল। অন্ধকার এক পৃষ্ঠপটে ততোধিক অন্ধকার সিলুয়েট মূর্তি কয়েকটা টাল খেয়ে খেয়ে পড়া কয়েকটা স্তব্ধ আকৃতির মাঝখান দিয়ে দেখা নির্বিকার নিস্তব্ধ কষ্টি পাথরের মতো শক্ত কয়েকটা মনুষ্যমূর্তি। নিচুতলার সেই সব প্রাণী যারা একদিন মানুষ ছিল।

শখটা এবার আমারই। তাই ভুললাম না। যে রহস্যময় অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে এক ঝাড়ু টিন হাতে জমাদার নিত্য

দেখা দেয় আমাদের এঁটোকাঁটা নোংরার পাশে সক্রিয় এক অলক্ষ্য যন্ত্রের মতো, ঠিক বিকেলবেলা, ক্যামেরা ঝুলিয়ে যাত্রা করলাম সেই ডেরার দিকে।

হোঁচট খেতে খেতে যেখানে গিয়ে পৌঁছলাম, সেটা কলকাতার সাধারণ যে কোন বস্তি থেকে একটুও তফাত নয়। ছ্যাতলাপড়া খোলার চাল। এবড়ো-খেবড়ো এলোমেলো পথ। খোলা ড্রেণের ওপর থকথকে সবুজ সর পড়া ময়লা। কাদা, মুরগী, কুকুর। নির্বিকার ঔদাসীন্যে কয়েকটা ন্যাংটা ন্যাংটা ছেলে মেয়ে খেলছে, চেঁচাচ্ছে। অদূরের একটা হাইড্রেণ্টের জলে বসে কাপড় কাচা সাবান দিয়ে অখণ্ড মনোযোগে গা ঘষে ঘষে চান করছে জনকয়েক ডিউটি ফেরত পুরুষ—তাদের চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই কি কাজ তারা করে। স্ক্যাভেঞ্জারের, না রিকশা টানার না মোটর গ্যারেজের না শিশি-কারখানার না স্রেফ কুলিগিরি—কিছুই বোঝা সম্ভব নয়।

নতুনত্ব শুধু একটি জায়গায়। ক্ষুদে আঙিনাটার এক পাশে কয়েকটা কদর্য দর্শন শুয়োর ঘোঁৎঘোঁৎ করছে আপন মনে।

আলোছায়ার খেলায় ফুটে ওঠা বিদেশী ছবিটার মতো রহস্যময়, অন্ধকারাচ্ছন্ন ও তীব্র হল না পৃষ্ঠপটটা। কেমন মামুলী ও সাধারণ। দৈন্যের চেহারাটাও কেমন তীক্ষ্ণ নয়, মাত্র বিবর্ণ। তবু একেবারে হতাশ হবার মতো নয়। বিশেষ করে ওই শুয়োরগুলো। ওদের সামনে রেখে বস্তির ঝুঁকে-পড়া চালের একটা কোণাকে কভার করে তার মধ্যে দিয়ে দেখা দূরের কয়েকটা প্রায় নগ্ন, কৃষ্ণকায় সিলুয়েটি মূর্তিকে, শুট করতে পারলেও মন্দ হবে না।

ডাকলাম, 'জমাদার জমাদার—'

আশেপাশে অনেক কটা খুপরি। এক একটা খুপরি কমপক্ষে এক একটা পরিবারের ডেরা। ওদেরই একটার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল জমাদার—'নমস্কার বাবু....

'নমস্কার, কিন্তু—'

কিন্তু বলে থামলাম। কারণ জমাদারকে ঝট করে চেনা একটু মুশকিল হয়েছিল। একটা অপরিবর্তিত চেহারাতেই শুধু জমাদারকে দেখা অভ্যেস। খড়ি-ওঠা নগ্ন শুকনো দেহ। কোমরে উরুর ওপরে তোলা ময়লা এক ঠুঁটো ধুতি। রুক্ষ চুল, নির্বিকার চাউনি, এক হাতে ঝাঁটা অন্য হাতে টিন।

কিন্তু কোথায় সে জমাদার? আমার সামনে এসে যে দাঁড়ালো, বোঝা যায় কিছুক্ষণ আগে তার চান খাওয়া-দাওয়া হয়েছে। মাথায় বেশ চকচকে কোঁকড়া চুল, কেমন গেঁয়ো গেঁয়ো ঢেউ খেলিয়ে খেলিয়ে সযতনে আঁচড়ানো। ধুতির ঝুল হাঁটুর নিচু পর্যন্ত নেমেছে। সদ্য খেয়ে ওঠা ফোলা ফোলা পেটের মাঝখান থেকে কোঁচা ঝুলছে বাবুর মতো। মুখে পান, কাঁধে ভেজা গামছা, কোলে একটা ছেলে। কোথায় আমার কল্পিত সিলুয়েটি নির্বাক মূর্তি, এ একেবারে নেহাত মামুলী, বাঙালী গেরস্ত। কোমল নির্বোধ, স্নেহময় এক পিতা।

নমস্কার বাবু কোথায় বা বসবেন—আমাদের সব···ছোঁয়া জিনিস····'।

বলে একটি মাদুর পেতে দিল দাওয়ায়। বেশ পরিষ্কার দাওয়া। বস্তিরই ঘর, তবু তার দরজায় রীতিমত সিঁদুরের শুভ চিহ্ন। মাটির দাওয়াটুকুর মধ্যেই খানিকটা পুরনো আলপনার দাগ। বললাম, না বসার দরকার নেই। আলো চলে যাবে। ছবিটা তুলে নাও আগে—

'আজ্ঞা হাঁ—' বলে জমাদার ঘরের দিকে তাকাল কয়েকবার। ছেলেটাকে কোল থেকে নামিয়ে ছেড়ে দিলে মাটির ওপর। 'এইটা আমার ছুটু খোঁকা···একটা শখ নাকি বলছেন বাবু···।' বলে আধা লজ্জা আধা কৃতার্থতার সঙ্গে জমাদার হাসলে স্বপ্নাতুরভাবে; এক সাধারণ মামুলী বাঙালী বাপের মতো। হাতে লোহার বালা পরা; পাঁশুটে পাঁশুটে চুলে-ভরা মাথা, সদ্য ওঠা শাদা শাদা দাঁত কয়েকটা, কচি কচি কালো মুখের মধ্যে হাসছে নির্বোধ খুশিতে—জমাদারের

ছোটো খোকা বাপের কোল থেকে ছাড়া পেয়ে দাপাদাপি করে বেড়াতে লাগল সারা দাওয়ায়।

আমার কল্পিত কম্পোজিশনটা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে একেবারে। তবু তাড়া দিলাম। সিলুয়েট চলবে না। তবু অন্তত এই নগ্ন সরলতাটুকু যদি তুলতে পারি মন্দ হয় না। ন্যাংটা কালো-কুলো ছেলেটাকে এনে দাঁড় করিয়ে দিলাম উঠোনের মধ্যে। ক্যামেরায় চোখ রেখে পেছুতে লাগলাম ঠিকমতো ভিউটার জন্যে।

'বাবু!' জমাদারের গলা!

চোখ না তুলেই জিজ্ঞেস করলাম, 'কি?'

'বলছি কি, ওইভাবেই ছবি লিবেন?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'না তা লিবেন বই কি। কিন্তুক জমাদারণী বলছিল কি, ওই তো ছুট্টু খোঁকা—খানিক সাজ-পোষাক করে দিলে—লইলে লুকে বলবে কি বাপটো খোকাটাকে একটা জামা বি কিনে ছ্যায় নাই। উ ছবিটাই তো থেকে যাবে। নাকি বলছেন বাবু—। বললাম, 'না না। জামা লাগবে না। এই ভালো—এতেই ছবির আর্ট ফুটবে, বুঝেছ?'

'বাবু!'

ফোকাস শেষ করেই এসেছিলাম, তবু তোলা হল না। জমাদারের গলার স্বর শুনে চমকে উঠতে হল। ভীত বিনীত চোখে জমাদার চেয়ে আছে ক্যামেরাটার দিকে। যেন ভয়ানক একটা সর্বনাশ হতে চলেছে তার।

'কি হ'ল?'

'ওই ছবি তো থাকবে। তো খোঁকাটো বড়ো হ'য়ে দেখবে কি, না বাপ আমার একটো জামা বি কিনে ছ্যায় নাই······'

হতাশ হয়ে ক্যামেরা নামিয়ে নিলাম। না আমার কিছুই করবার নেই। কিছু করবার নেই ক্যামেরার।

'তুমি কেন আপত্তি করছ···বেশ যাও সাজিয়ে নিয়ে এসো ছেলেকে। আর তোমরাও এসো—'

জমাদারের দুই চোখ ভরে উঠল খুশিতে 'আজ্ঞা বাবু—ই···একটা···নাকি বলছেন···

সুতরাং বসে বসে অপেক্ষা করতে হল ওরা কখন সাজ-পোষাক করে বেরিয়ে আসে তার জন্যে। ক্যামেরা দেখে ইতিমধ্যে ভিড় জমে উঠেছে একটা। বস্তির মামুলী ছেলেপুলে, বুড়ী বুড়ো আর ভারিক্কী চেহারার জোয়ান মেহনতকারীর ভিড়। তারা ফিসফিস করছে নিজেদের মধ্যে, কখনো এগিয়ে আসছে ক্যামেরাটার কাছে, কখনো চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে আবার শুরু করছে খেলা। সবটাই কেমন বিবর্ণ, গতানুগতিক।

বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত ধরে গেল। ঘরের মধ্যে থেকে অস্ফুট একটা শব্দ আসছিল একঘেয়ে। জমাদার, জমাদারণী আর তার খোকার কণ্ঠস্বর। বোঝা যায় খুব চাপা আলোচনা চলছে ওদের মধ্যে—হয়ত বা ঝগড়াও হচ্ছে।

'কি জমাদার, হল ?'

ঘরের ভেতরকার শব্দটা থেমে গেল একেবারে, আবার শুরু হল। আবার থেমে গেল। তারপর শুকনো মুখে বেরিয়ে এল জমাদার একা।

'কই ?'

জমাদার আমার চোখোচোখি তাকালে না। অন্যদিকে চেয়ে বললে, 'বলছি কি, আজ ওই জমাদারণী আর খোকার ছবিটা নেন। আমারটা থাক ক্যানে। না হয় সে আর একদিন—

'কেন ? কি হল আবার ?' কেন, তা জমাদার বললে না।

তবে ব্যাপারটা বোঝা গেল জমাদারণীর মুখঝামটায় "জামা নেইক, শখ আছে। উ ফাটোক তুলবে না। না, তেমন সাজ পোষাক চাই তো। আর ই জমাদারণী তুলুক ঐ ছেঁড়া কানি পরে ? ক্যানে ? আমি বি তুলব না···'

বিব্রত হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর স্থির হল আজ শুধু খোকার ছবি তুললেই হবে। জমাদার জমাদারণীর ছবি না হয় পরে তুলে দেওয়া যাবে একদিন।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল খোকাকে নিয়েও। খোকার জন্মের সময় এক রথের বাজার থেকে জমাদার খোকার জন্যে পয়সা খরচ করে ফ্রকের মতো একটা রঙীন জামা কিনেছিল। সেটা অক্ষত আছে। কিন্তু খোকার গায়ে ঢোকে না। টেনে-টুনে ঢোকালেও তার ঝুলটা বড়ো জোর কোমর পর্যন্ত নামে। বাকি অংশটা অনাবৃতই থেকে যায়। গায়ে ঢোকার মতো আর-একটা জামা আছে, সেটা খোকার ছেলেবেলায় কেনা। তাই পুরনো, নোংরা, ছেঁড়া। সেটা পরাতে জমাদার রাজী নয়।

বললাম 'ওটুকু নোংরা ছেঁড়ায় কিছু হবে না। ক্যামেরায় উঠবে না।'

কিন্তু কে কাকে বোঝায়। জমাদার জমাদারণীর কথা কাটাকাটি বেড়েই চলল। শেষ পর্যন্ত মাথা নিচু করে জমাদার আমাকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিলে, 'আজ হল না বাবু, আমাদের···কি করা যাবে! তবে ফির আর একদিন লিয়ে আসা যাবে আমনাকে। নাকি বলছেন···একটু লতুন জামা কাপড় লইলে—নাকি বলছেন বাবু?'

বাড়ি ফিরে এসে মাকে বললাম, 'একটা ছোটো জামা দ্যাখো তো। জমাদারের ছেলেকে দিতে হবে। নইলে ওর ছবি তোলা হচ্ছে না।'

পুরনো বাক্সের স্তূপ ঘেঁটে মোটামুটি অক্ষত একটা জামা পাওয়াও গেল। জটের মতো পাঁশুটে চুলে ভর্তি কালো-কুলো কচি ছেলেটার গায়েও হবে মনে হল। পরের দিন জমাদারকে দিতে সে একেবারে আনন্দে আটখানা হয়ে উঠল, 'লিয়ে যাবো মা। এখন তো ঝাড়ু-মাড়ু

দিতে হবে। অমন সোন্দর জিনিসটা নাকি বলছেন, নোংরা হয়ে যাবে। তবে লিয়ে যাবো। জমাদারণী খুব খুশী হবে মা—'

জামাটা জমাদার নিয়ে গিয়েছিল কাজ সেরে বাড়ি যাওয়ার পথে। কিন্তু তবু কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। তাই নিজে থেকেই তাড়া দিতে হল, 'কি জমাদার, জামা তো হয়েছে। এবার তোমার খোকার ফোটো তুলে নেওয়া যাক একটা?'

জমাদার বললে, 'হাঁ বাবু, সোন্দর জামা, ধম্মকথা। ফোটোক ইবার তুলবেন বই কি, নাকি বলছেন······'

বলে আপন মনে গভীর মনোযোগে ড্রেণের ঝারিটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ময়লা পরিষ্কার করতে শুরু করলে। তারপর তার বাড়িতে পালা সেই শুয়োর কটার জন্যে হেঁশেল থেকে ফেলে দেওয়া এঁটোকাঁটা আর বাসি রুটি ভাত তরকারির পিণ্ডগুলো গামছায় বাঁধতে লাগল পরিপাটি করে।

'তা হলে কবে?'

জমাদার তারিখও দিলে কয়েকবার কিন্তু ছবি তোলা হল না। জমাদার নিজেই আবার সে সব তারিখ পালটে জানিয়ে দিয়ে গেল— 'সে আর একদিন···'

এ আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেছে। চেপে ধরলাম, 'কি ব্যাপারটা কি খুলে বলো—'

গাইগুঁই করে জমাদার শেষ পর্যন্ত জানালে, হাঁ বাবু, জামাতো দিলেন, ধম্মকথা। না কি বলছেন বাবু? সোন্দর জামা, ছেঁড়া-খোঁড়া কি সেলাই কিছু বি নাই। না কি বলছেন বাবু? তবেই তো আমনাদের দেওয়া,—তো খোকা বড়ো হয়ে উ ফোটোক তো দেখবে? তো বলবে কি ই পরের জামা দিয়ে ছবি তুলেছিল বাপটা—এই কথা বাবু। আমাদের জমাদারদের···কি বলব আমনাকে···'

জমাদারের প্রৌঢ় রহস্যময় নেশাচ্ছন্ন চোখ দুটো তাকিয়ে আছে ভীত লজ্জায়।

তবু বললাম, 'এ ছবি দেখে কেউ কখনো বুঝতে পারে, এ নিজের জামা না পরের জামা ?'

জমাদার বিনীতভাবে মাথা নাড়ল 'হাঁ বাবু, উতো ঠিক কথা। তবে একটা নিজের রোজগারে....নাকি বলছেন বাবু! খোকাটা বড়ো হয়ে বলবে কি হাঁ আমার একটা বাপ ছিল, উ এ পিরানটা খরিদ করে দিয়েছিল আমার লেগে।...নাকি বলছেন বাবু? এই আর কি...?'

ক্ষয়গ্রস্ত, প্রৌঢ় দুই নেশাচ্ছন্ন চোখ আমার দিকে তাকিয়ে নেই, তাকিয়ে আছে শূন্যে—এক আকাঙ্ক্ষার আকাশ নিয়ে।

পৃথিবীতে অনেক বড়ো বড়ো আকাঙ্ক্ষা আছে। তাদের মূর্তি অসাধারণ। জমাদারের আকাঙ্ক্ষাটা তেমন অসাধারণ নয়, একান্ত গতানুগতিক। তবু ইচ্ছে হয়েছিল, বলি 'তাই হোক জমাদার। নিজের মেহনতের রোজগারে নিজের পুত্র পরিবারকে সজ্জিত করার নিতান্ত মামুলী এই একটা স্বপ্ন তোমার সার্থক হোক। মনে হয়েছিল, এমন ক্যামেরা কি পাওয়া যাবে যাতে ছবি তোলা সম্ভব এই সাধারণ নিতান্ত সাধারণ একটা প্রৌঢ় স্বপ্নের ?

•

দীর্ঘদিন তারপর ছবির কথাটা ওঠে নি। আমি ভুলে গিয়েছিলাম। জমাদারও ভুলে গিয়েছিল কি না কে জানে। দিন চলেছে খবরের কাগজের শিরোনামায় হোঁচট খেতে খেতে। নির্বাচন, মন্ত্রী, পরিকল্পনা, নতুন পরিকল্পনা, সংশোধিত পরিকল্পনা, দ্বিতীয় পরিকল্পনা—চাকা ঘুরছে ঊর্ধ্বশ্বাসে !

এর মধ্যে জমাদার দৈনিক আসে ঠিক সেই আগের মতো। নোংরা পরিষ্কার করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। বাড়ির ছেলেপুলেরা কেউ মাটি থেকে কোন জিনিস খুঁটে খেলে বকবক করে অভিভাবকের মতো। ছোঁয়া লাগার ভয়ে থমকে দাঁড়ায় উঠোনে কাপড় মেলা থাকলে। ঘড়াংঘড়াং শব্দ করে ঝাঁটা ফেলে তার নোংরা-বওয়া

টিনটার মধ্যে। তারপর বাড়িটার নানা ভাড়াটের নানা হেঁশেল থেকে যে উদ্বৃত্ত বাসি রুটি, পাতের ভাত আর এঁটোকাঁটা পড়ে থাকে তা পিণ্ড পাকিয়ে বেঁধে নেয় তার ছেঁড়া গামছাটায়।

মোটামুটি নিস্তরঙ্গ মামুলী জীবনযাত্রাটার মধ্যে ঠিক আগের মতোই জমাদারকে কেউ লক্ষ্য করে না। লক্ষ্য করার প্রয়োজন হয় না। জমাদারও পারতপক্ষে পড়তে চায় না কারো লক্ষ্যের মধ্যে।

একদিন জমাদারই মনে করিয়ে দিলে, 'নমস্কার বাবু—'

'নমস্কার, কি খবর জমাদার?'

'না তাই বলছিলাম। সেই খোকাটা, ছুটু খোকা—উ তো ভগবানের দয়ায় বড়ো হয়ে উঠল বেশ। আমনি আর দেখেন নি। তাই জমাদারণী বলছিল, এবার বাবুকে—'

অর্থাৎ সেই ফটো। চমকে উঠলাম, জমাদার এতদিনেও ভোলে নি।

'কিন্তু তোমার খোকার পোষাক কি কেনা হয়েছে···? সরকারী পরিকল্পনার ফল ফলছে তাহলে বলো—'

অভ্যস্ত আধা রহস্য আধা অনুকম্পায় জিজ্ঞেস করলাম। কারণ যারা জমাদার নয়, তারা জমাদার শ্রেণীর সঙ্গে কথা কইলে অমনি অনুকম্পা ও অমনি রহস্য ছাড়া কি করে কথা কইবে?

'আর বাবু তামাসা করছেন····' বলে জমাদার হাসল অনুগৃহীতের মতো, তারপর জানালো 'ওই যে শুয়োরটা পালছিলাম। উ বাচ্চাগুলাও বড়ো হয়ে গেল। তা এতদিন বেচি নাইক, না বড়ো হলে দুটো টাকা আসবে, নাকি বলছেন। তা ইবার বেচে দিব—আজ্ঞা হাঁ। উতে একটা পিরান হয়ে যাবে নাকি বলছেন?'

বললাম, 'বেশ, যাবো পরশু বিকেলে—'

ফটো তোলার শখটা ইতিমধ্যে কবে যে উবে গিয়েছিল তা খেয়াল ছিল না। ক্যামেরাটা আর নতুন একটা ফিল্ম নিয়ে রওনা দিলাম। নিজের ঝঞ্ঝাট ইতিমধ্যে বেড়ে গেছে অনেক। সংসারে

নিত্য অনুযোগ—কারু পড়া হচ্ছে না, কেউ চাকরি পাচ্ছে না, কারো বা চিকিৎসার জন্য ন্যূনতম অর্থও সংগ্রহ করা হয়ে উঠল না। জমাদারের ছেলেটার ছবি তুলে এবার দায়মুক্ত হতে পারলেই ক্যামেরা শখটাকে আরো অনেক শখের মতোই বিক্রি করে দেওয়া যাবে।

হোঁচট খেতে খেতে আবার গিয়ে পৌঁছলাম। সেই বস্তিটায় চারিদিকে মামুলী কোলাহল কর্মব্যস্ততা। মাটির ওপর থেবড়ে বসে কাঁপা কাঁপা হাতে প্যাটপেটে ফোঁড় দিয়ে আপন মনে সেলাই করছে এক থুড়থুড়ে বুড়ো। পাঁশুটে চুলের জট দুলিয়ে ন্যাংটা ন্যাংটা কয়েকটা ছেলেমেয়ে আপন মনে খেলছে, চ্যাঁচাচ্ছে। হাইড্রেণ্টের ঘোলা জলে থুবড়ে থুবড়ে কাপড় কাচছে এক কিশোরী গিন্নী আর কাদার মধ্যে কোঁৎকোঁৎ করছে কয়েকটা কদর্য শুয়োর।

শুয়োর কদর্য হয় জানি কিন্তু এমন প্যাকাটির মতো দেখতেও যে হতে পারে ভাবিনি কখনো।

ডাকলাম, 'জমাদার, জমাদার!'

কিছুক্ষণ কোনো সাড়া এল না। তারপর ঐ বস্তিরই কোন একটা কামরা থেকে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল জমাদার, 'নমস্কার বাবু…'

'কই, কি ব্যাপার, ছবি?'

জমাদারের প্রৌঢ়, অপেক্ষমান, রাঙা রাঙা চোখ দুটো কাঁপল একটু। তারপর কোনো উত্তর না দিয়ে সরে গেল সামনে থেকে। শুধু ঘরের ভেতর থেকে একটা বিদঘুটে চাপা মেয়েলী কান্না আচমকা বিকৃত গলায় চেঁচিয়ে উঠে তেমনি আচমকা স্তব্ধ হয়ে গেল আবার।

ক্যামেরা আর ভদ্রলোক দেখে সেই আগের মতোই ছোটো একটা ভিড় জমেছিল আশেপাশে। খবরটা জানা গেল তাদের কাছ থেকে। জমাদারের ছোটো খোকা মারা গেছে আজ সকালে হাসপাতালে কলেরায়। কি করা যাবে, খেতে হবে তো। জমাদার

সাতবাড়ির কাজ করে যে এঁটোকাঁটার পিণ্ড নিয়ে আসতো শুয়োরের জন্যে তা থেকে বেছে বেছে জমাদারণী খাওয়াত ছেলেটাকে। হাঁ, জমাদার রোজ বারণ করেছে। কিন্তু কি করবে। বারণ করেছে কি, খাওয়াস না। তা হলে শুয়োরগুলো কি খাবে? শুয়োরগুলোর গতরে মাংস লাগছে না। কিন্তু কি করা যাবে। বুড়ো মানুষ খেলে হয়ত কিছু হত না। কিন্তু ও বাচ্চা—কি বাসি না পচা না কি খেয়েছে, বাস এক বেলাতেই…'

মামুলী কাহিনী। ১৯৫৪ সালে কলকাতার এ মামুলী কাহিনীটা খবরের কাগজে পর্যন্ত ওঠার মতো নয়। শুধু—ঘরের ভেতর থেকে বিকৃত বিদঘুটে কান্নাটা মাঝে মাঝে গুমরে উঠতে লাগল। আবার থেমে যাবে আচমকা। একটা কালো-কুলো বাচ্চা ছিল এই বস্তিতে। সে নেই।

'ছবি লিবেন না বাবু?' ফিরে যাচ্ছিলাম। যে ভিড়টা জমেছিল তাদের মধ্যে থেকে কে যেন বললে। চমকে ফিরে তাকালাম। মামুলী কলকাতার বস্তি। মামুলী দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ, ছেলেপুলে, হাইড্রেণ্ট, শুয়োর। শিশু, নারী, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, অপেক্ষমান কয়েক জোড়া স্তব্ধ চোখ! জমাদারও এর মধ্যে আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে কোথায় সে আছে খুঁজে পাচ্ছি না।

ছবি? হাঁ, হাঁ, একটা ছবি তুলতে চাই। জ্বালা জ্বালা করছে চোখ দুটো। নিঃশ্বাস আটকে আটকে যাচ্ছে। আমার হাতে ক্যামেরাটা কাঁপছে থরথর করে—একটা ছবি তুলতেই হবে। কি ছবি জানি না, কার ছবি জানি না। কিন্তু একটা ছবি চাই! সে ছবি সাধারণ, আর কে জানে তাই বুঝি এত ভাস্বর। নৈমিত্তিক, আর কে জানে তাই বুঝি এত অসহ্য।

একটা ছবি যদি তুলতে পারতাম।

বুড়ো লোকটার গল্প

তাজমহল দেখতে এসেছি আমরা জনকয়েক বন্ধু। দিনের বেলা যাই নি, ঠিক করেছিলাম দিনে যাবো না। একেবারেই শুভদৃষ্টি হোক পূর্ণিমার চাঁদ সাক্ষী রেখে। কারণ, শোনা ছিল চাঁদনী রাতের তাজমহলের নাকি তুলনা নেই। আমরা সেই অতুলনীয়াকেই দেখতে চাই, দিনের প্যাটপেটে আলোয় স্পষ্টাস্পষ্টি তাকিয়ে স্বপ্ন খুইয়ে বসতে চাই নি।

দেখলাম, অপূর্ব। তাজমহলকে মোহময় করে তোলার জন্যে চাঁদের চক্রান্তের যেন শেষ নেই। যাদু লেগেছে চারিদিকের গাছ-পালার নিঃশ্বাসে। আলোর সঙ্গে নরম পা ফেলে এসেছে ছায়া। শূন্যের ওড়নায় মিশেছে রেশমী নীলের রেশ। আকাশ ছেয়েছে গুঁড়ো গুঁড়ো রূপোর মায়ায়। আর এই সব কিছু বিলাসের উপকরণ যেন অবহেলায় ঠেলে ফেলে কেন জানি উন্মনা হয়ে সহসা উঠে দাঁড়িয়েছে এক নগ্নতম শুভ্রতা—তাজ!

দেখতে গিয়ে কথা ফুরিয়ে আসে, চোখ অসহায় হয়ে ওঠে; বুকের মধ্যে কিছু একটা উদ্বেল হয়ে উঠতে চায়, কিন্তু কী সেটা, কী—তা কিছুতেই বোঝা যায় না।

কিন্তু সে শুধু প্রথম কয়েক মুহূর্ত। তারপর কিছুতেই আর সেই স্তব্ধ শিহরণের আচ্ছন্নতাটা ফিরে এল না। সব কিছু কেমন যেন কেটে কেটে যেতে লাগল। আর বলতে কি কিছুক্ষণ বাদে সত্যি করে আফসোস হতে লাগলো, মরতে কেন যে এই পূর্ণিমার রাতটাতেই এলাম। যতো রাজ্যের লোক, যেন বেছে বেছে ঠিক এই

রাতেই এসে সব জুটেছে। যতো রাজ্যের টুরিষ্ট, ভ্রমণ-বিলাসী, সংস্কৃতি গরবী এবং তাদের পেছন পেছন বাচাল গাইডের দল সবাই এসে অতি আধুনিক কায়দায় সশব্দে সহর্ষে তারিফ করতে শুরু করেছে—ওঃ, ফাইন! সুপার! সাবলাইম্! জাষ্ট লুক!

ক্লিক্। ক্লিক্। ক্লিক্। এ কোণ থেকে ও কোণ থেকে উচ্ছ্বসিত সপরিষদ আমেরিকান ভ্রমণকারিণী আর আত্মতৃপ্ত মাদ্রাজী বড়ো সাহেব, আর আহ্লাদিনী বাঙালী আধুনিকা, আর সাঙ্ঘাতিক স্মার্ট পাঞ্জাবী অফিসার-পুত্ররা কাঁচা হাতে পাকা ক্যামেরা নিয়ে ঘুরছে। মুন্‌লিট তাজমহলের ছবি নইলে উপভোগ কি। হাঁটতে গেলেই পেছন থেকে অনুরোধ—প্লীজ! অন্যের নিযুক্ত গাইড এসে সসম্ভ্রমে জানিয়ে যাচ্ছেঃ জনৈক অতি গুরুত্বপূর্ণ এক বিদেশী অন্ধকারে ইনফারেড্ এক্‌স্‌পোজার দিয়ে অপেক্ষা করছেন—আরো দু' মিনিট যেন সামনের ভিউটা আমরা ডিস্টার্ব না করি।

এ সবও সহ্য হচ্ছিল—সশব্দ প্রশংসা সঘূর্ণন সাড়ি, স্কার্ট, ট্রাউজার; মোঘল পাথরের ওপর ভুক্তাবশেষ আইসক্রীম কাপ, কোকোকোলার ষ্ট্র; যমুনার সোঁতা হাওয়ায় রাশিরাশি সিগারেটের উড়ন্ত ছাই, তাজমহলের রূপে মুগ্ধ ক্যামেরার অনবরত চোখমারা—এসবও সইতে পারতাম, কিন্তু হঠাৎ চাঁদ একটু ঘন হয়ে আসা মাত্র অতি ব্যাকুল ভাবাবেগে কোন একটা কোণ থেকে অতি দোদুল একটি সুর জাগল বোম্বাই সিনেমার।—এবং তার চেয়েও মারাত্মক আশেপাশে অনেকে তাতে বেশ বাহবা দিতে লাগল, শিস্ শুরু হয়ে গেল।

মনটা একেবারে খিচড়ে গিয়েছিল। সমীরের ভাবখানা হয়েছে এমন মরিয়া যে ভয় হয় সামনে যাক পাবে তাকেই ঘুষি মেরে বসবে। পেছন থেকে ক্যামেরাধারিণীর 'প্লীজ' কানে এলেই পরাশর দাঁত মুখ খিঁচিয়ে রুখে উঠতে লাগলঃ ম্যাডাম, সম্ভবত একটু ভুল হয়েছে। দেখেছি রাজামণ্ডিতে একটা কার্নিভাল হচ্ছে। বোকা

টাঙ্গাওয়ালা নিশ্চয়ই ভুল করে আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে। যদি এখনও ফিরে যান উপযুক্ত জায়গাতেই যাবেন।

দু' একবার বিপদেও পড়তে হল। বিদেশীরা লজ্জা পেলেও নয়াদিল্লী থেকে উইক এণ্ড ট্রিপের মেজাজ নিয়ে যেসব সেক্রেটারিয়েট অফিসার এবং অফিসার-পুত্ররা ঘুরছিলেন, তাদের লজ্জা দেবে কে। ছাপমারা হাওয়াই সার্টের ঝলক বইয়ে তারা সগর্জনে পাল্টা রুখে উঠেছিল কয়েকবার। অবশ্য মারপিট পর্যন্ত গড়ায় নি। বহু চেষ্টায় গড়াতে দিই নি। দ্ব্যর্থবোধক উক্তি করে মিটিয়ে নিতে হয়েছে, আর ওরাও সতৃপ্তিতে পুনরায় শিস্ দিতে দিতে ফিরে গেছে সঙ্গিনীদের কাছে।

তবুও তাজকে ছেড়ে যেতে পারলাম না। 'মুনলিট' বলে রাত বারোটা পর্যন্ত গেট খোলা থাকবে। বারোটা পর্যন্তই আমরা রইলাম। কখনো ছাড়া-ছাড়া হয়ে ঘুরছি কখনো ছায়ার মতো আবার একসঙ্গে এসে মিলছি। কখনও অপরিচিত কারো সঙ্গে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ভালো লাগছে কথা কইতে। কখনো ওই সব সশব্দ প্রশংসাকারীদের দঙ্গল থেকে পালাবার চেষ্টা করছি প্রাণপণে।

ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত যেখানে গিয়ে বসলাম; দেখা গেল সেখানে আমরা কেমন একটা নতুন দল হয়ে উঠেছি। আমরা জন তিনেক বন্ধু ছাড়াও আমাদের সেই দলে কেমন করে যেন জুটে গেছেন এক কালো কোট কালো টুপি-পরা জনৈক প্রৌঢ় বাঙালী, নিতান্ত গ্রাম্য চেহারার একটি বিহারী পরিবার—ওরা স্বামীস্ত্রী আর দুটি ছেলেমেয়ে, ফাটা ফাটা খালি পা একজন মুসলমান ভিস্তিওয়ালা, আর আমাদের থেকে একটু দূরে ঘাগরা ছড়িয়ে ভিরু ভিরু চোখে পাখির মতো লজ্জায় বসে আছে একটি রাজস্থানী তরুণী বধূ, আর তার পাশে সমান অবাক হয়ে উঁচু হয়ে বসেছে বোধ হয় তার মরদ? কাঁধ থেকে লাঠিটা নামাতেও যেন সে ভুলে গেছে।

ক্যামেরা আর কোকোকোলা আর হাঁওয়াই সার্ট থেকে জায়গাটা অনেক দূরে। তাজকে সবচেয়ে ভালো করে দেখার মতো কোণ এটা নয়, তবু ওদের হাত থেকে বাঁচার মতো জায়গা। কিছুক্ষণ নিঝুম হয়ে বসে রইলাম আমরা সকলেই, এমন কি ওই বিহারী পরিবারটির বাচ্চা ছেলেমেয়ে দুটি পর্যন্ত। তবু সেই প্রথম দেখার নেশা যেন কিছুতেই ফিরছিল না। উশখুশ করতে করতে একবার উঠে দাঁড়ালাম।

ভাঙা ভাঙা গলায় ভারি আস্তে কে যেন বললে, 'বাঙালী বাবু বৈঠ না। বৈঠ যা।' তাকিয়ে দেখি সেই হাঁটুর ওপর লুঙ্গিপরা, চওড়া ফাটা ফাটা পা শাদা দাড়ি ভিস্তিওয়ালা। বসে পড়লাম বটে, তবু বললাম 'ভালো লাগছে না যে। তোমার ভালো লাগছে?'

দেখলাম জ্যোৎস্নায় অবাক হয়ে চাইল আমার দিকে শাদা দাড়ির চওড়া ঝাপসা একটা মুখ। জবাব না দিয়ে কাঁপা কাঁপা শ্লেষ্মাভাঙা গলায় লোকটা আবার বললে ফিসফিসিয়ে, 'বৈঠ যা বাঙালীবাবু। দেখ লে। আমার নাম আছে রহমান ভিস্তিওয়ালা। চব্বিশ বছর আগে একাই এসেছিলাম। আর মরার আগে এই এসেছি। দেখলে বাঙালী বাবু···।

সে কথায় সত্যিই এমন কিছু ছিল যাতে আমরা চুপ করে গেলাম। আর আমাদের মধ্যে পরাশর—ছেলেটা একটু কবি কবি—হঠাৎ এক অদ্ভুত প্রস্তাব করে বসল: বারোটা পর্যন্ত আমরা তো আছি। প্রত্যেককে তাদের জীবনের প্রেমের গল্প শোনাতে হবে। রাজী?

মন্দ নয় প্রস্তাবটা। আমরা কয়েকজন এক এক করে ভালোবাসার একটি করে গল্প বলতে লাগলাম—টেনে টেনে, স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো। মনে হল বেশ লাগছে। মনে হল অন্য সঙ্গীরা কথা না বললেও কান পেতে যেন তা শুনছে—সেই কালো টুপি-পরা প্রৌঢ়, বুড়ো ভিস্তিওয়ালা এমনকি বিহারী পরিবারটা পর্যন্ত।

চাঁদ ধীরে উঠে এসেছে গম্বুজের কোলে। ধীরে ধীরে ছায়ার রঙ পালটাচ্ছে, আলোর রঙ।

তবু হঠাৎ এক সময় ক্লান্ত হয়ে থেমে গেলাম আমরা। কেন জানি, কেবলি মনে হতে লাগল তাজমহলের পাথরে বসে আমাদের জীবনের এই সব প্রেমের গল্প যেন বড় ঠুনকো, বড়ো তুচ্ছ, বড়ো দীনতা ভরা। ভেতরে ভেতরে কেমন অপরাধী মনে হল নিজেদের। মনে হল বড়ো কিছু শোনার দরকার আমাদের। তাজমহলকে ছাড়িয়ে না গেলেও যা অন্তত তাজমহলের সমান। চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একবার দেখলাম আমাদের সঙ্গীদের—ভিস্তিওয়ালা, রাজস্থানী দেহাতী মেয়ে, মরদ, সপুত্র-কন্যা বিহারী পরিবার। তারপর পরাশর হঠাৎ কাছ ঘেঁষে গেল সেই কালো প্রৌঢ় লোকটির কাছে, 'দেখেছি, আপনি আমাদের গল্প শুনছিলেন, কিছু বলছিলেন না। আপনাকে এবার একটা শোনাতে হবে—'

ভদ্রলোক ভয়ানক চমকে উঠলেন, আমি! আমি কেন! আমি কি বলব?'

'আপনার জীবনে যা হয়েছে তাই?'

'কিন্তু আমার জীবনে যে কিছুই হয় নি ভাই।' ভদ্রলোক বিচলিতভাবে মাথার টুপিটা খুলে তাকিয়ে রইলেন হতভম্বের মতো, তাছাড়া আমি, আমি চিরকাল লোহা-লক্কড় নিয়ে কাটিয়ে এখন অবসর নিয়েছি! এ সব...'

ভদ্রলোকের মুখের দিকে এতক্ষণে বোধ হয় আমরা ভালো করে তাকালাম। কঠিন উত্তাপ আর দৈহিক পরিশ্রমের মধ্যে আজীবন কাটাতে হলে যা হয়, তেমনি পোড়া পোড়া কালচিটে রঙ ধরেছে ওর সারা মুখে। বয়স যতোটা ভেবেছিলাম তার চেয়েও বেশি। চোখ দুটো কেমন নিষ্প্রভ, নির্বিকার।

পরাশর জিদ ধরল, 'তবু বলতেই হবে আপনাকে। নিজের না হলেও যা শুনেছেন, যা দেখেছেন—'

অন্য কোনো সময় হলে আমি কল্পনাই করতে পারতাম না, ওইরকম যার চেহারা এবং আমাদের মতো অর্বাচীনদের থেকে অতোখানি যাঁর বয়সের তফাত তিনি বসে বসে আমাদের প্রেমের গল্প শোনাচ্ছেন। কিন্তু কে জানে বাঙলার বাইরে বলেই, নাকি তাজমহলের যাদুর মধ্যে এমন কিছু একটা ছিল যাতে ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি আমাদের পেড়াপীড়ি মেনে নিলেন। আনাড়ীর মতো অনেকবার এলোমেলো হয়ে, অনেকবার হঠাৎ বলতে না চাওয়া কোনো জিনিস বলে ফেলে তিনি শোনাতে লাগলেন—

'প্রেমের গল্প শুনতে চাইছেন আপনারা। কিন্তু সত্যি কথা বলতে আমাদের সমাজে প্রেম কোথায়? এ যুগে অবস্থা কতোটা পালটিয়েছে তা আপনারাই জানেন। কিন্তু আমাদের যুগে অনাত্মীয় মেয়ের সঙ্গে একটা ছেলে কথা কইছে এ ঘটনাই আমরা দেখতে পেতাম না। সে অবস্থায় প্রেমের সম্ভাবনা কতটুকু? তা ছাড়া ছিল বাপমায়ে ঠিক করে দেওয়া বিয়ে। কিন্তু নিশ্চয়ই বিয়ের গল্প আপনারা চান না। তা ছাড়া বিয়েও আমার হয়নি। ফলে অন্ততঃ আমার জীবনে প্রেমের কোনো পরিচয় নেই।

অথচ বলতে গেলে আমাদের বাড়ীর সমাজটা সে সময়ের তুলনায় আধুনিকই ছিল। অর্থাৎ কলকাতার যে অল্প একটু অংশে ছেলেমেয়েরা মিশতে পারত আমরা সেই সমাজের লোক। বলছি মিশতে পারত, কিন্তু একেবারে একলা নয়। কেউ থাকতেন, মা নয় জ্যাঠামশায় নয় অন্য কেউ। তবু একটু স্বচ্ছন্দভাবে কথা কইলে, অনাত্মীয় যুবক বা যুবতীকে বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্ন করলে মহাভারত অশুদ্ধ হত না। কিন্তু ওই বলেছি, কেউ থাকতেন, উদারনৈতিক কোনো গুরুজন। আর তা ছাড়া কেউ না থাকলেই বা কি। সে যুগে ভালোবাসা কি তাই ভালো করে কেউ জানত না। কেউ যখন বুঝত, তখন সাহস করে ক'জনই বা তা বলতে পারত?

না, আমাদের সমাজটুকু কিছুটা আধুনিক হলেও প্রেমের কথা বলা সেখানেও সহজ ছিল না। যাই হোক, একে এই সমাজ, তাতে আমি লোকটা আবার একটু ছিলাম কাটখোট্টা গোছের—বিজ্ঞানের ছাত্র, পরে ঢুকেছিলাম লোহার কারখানায়—সেখানেই আজীবন কাটিয়েছি। সুকুমার হৃদয় বৃত্তির ব্যাপারটা ঠিক আমার আসত না। তবে আমাদেরই কালের একটি ঘটনা আমি জানি যা বলা যেতে পারে।

ঘটনাটা লতিকাকে নিয়ে। লতিকা সম্পর্কে আমার এক আত্মীয়ের মতো। কলেজে পড়েছিল। খুব ভালো পাশও করেছিল। ইংরেজী কাব্যে দখলও নাকি ছিল অসাধারণ। দেখতে? সুন্দরীই। তবে আসলে কতোটুকু আর সুন্দর। ওর চেয়ে অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেছি। কিন্তু কি জানেন, অনাত্মীয় ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা যারা করছে তারা সুন্দরী না হলেও কেমন একটা নাম ছড়িয়ে যায়। লতিকারও নাম ছড়িয়ে গিয়েছিল।

লতিকা তার সমস্যার কথা মাঝে মাঝে আমাকে বলত। একদিন বললে, বোধ হয় তাকে ভালোবেসেছে একজন। কে? বললে, দ্বিজেন।

তাকে বলেছ?

না বলতে পারি নি। তবে দ্বিজেন চিঠিতে জানিয়েছে।

দ্বিজেনকে আমিও চিনতাম। এণ্ট্রান্স পর্যন্ত একই সঙ্গে পড়েছি। চমৎকার বিদ্যাবুদ্ধি। জীবনে বড়ো কিছু একটা করবে তাতে সন্দেহ ছিল না। গান করত আশ্চর্য। শিল্পী কাকে বলে আমি বিশেষ জানি না। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় মনে হয়—জীবনে ওই একটি শিল্পীকেই আমি দেখেছি।

লতিকাও ভালো গাইতে পারত। বললে, 'দ্বিজেন বলে, দুজনে মিলে আমরা এক সুখের জগৎ গড়ে তুলব। পারব না রবিদা?'

কিছুক্ষণ চুপ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। তারপরে বলেছিলাম নিশ্চয়ই! প্রেম জীবনকে কতো উঁচুতে তুলে দিতে পারে তা কে বলতে পারে।

বলেছিলাম এমনি শোনা কথা হিসেবে, তখনো তাজমহল দেখিনি। আসলে এই প্রথম আমি তাজমহলে এলাম। কিন্তু সে কথা যাক। যা বলছিলাম।

স্বপ্ন কাকে বলে তা সেদিন লতিকার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি দেখেছিলাম। আর আমি জানতাম সে স্বপ্ন সত্যি হওয়া অসম্ভব নয়। আমি বৈজ্ঞানিক। আমি তো জানি, কি অসম্ভব স্বপ্নও মানুষ সত্যি করে দিতে পারে।

স্বপ্নের ঘোরে যেন লতিকা সেদিন তার জীবনের যতো কল্পনা সব বলে গেল। অথচ এত যে স্বপ্ন, দ্বিজেনকে মুখ ফুটে সেটুকুও বলতে পারে নি।

ইতিমধ্যে আমারই ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের এক বন্ধুকে একদিন সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম লতিকাদের বাসায়। নাম তার মাধব। লতিকা যেমন করে, তেমনি স্বচ্ছন্দে সে তাকেও চা এগিয়ে দিয়েছিল, তার সঙ্গে সহজভাবে কথা কয়েছিল। কিন্তু মাধবের কি যে হল, লতিকার জন্যে যেন ও পাগল হয়ে উঠল।

প্রথম প্রথম আমার কাছে আসত—কোনো একটা ছুতো করে ওকে যেন লতিকাদের বাসায় আমি নিয়ে যাই। প্রথম সেদিক দিয়ে আমি তাকে সত্যিই একটু সাহায্য করেছিলাম। কেন না, ছেলে হিসেবে মাধবেরও কয়েকটা আশ্চর্য গুণ ছিল। দ্বিজেনের মতো ওরা বড়ো লোক ছিল না বটে, কিন্তু প্রতিভা ওরও ছিল। আমরা ধরে রেখেছিলাম আমাদের ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজটার নাম ও উঁচু করবে। আর হয়ত যে বৈজ্ঞানিক যান্ত্রিক দক্ষতায় বাঙালী পিছিয়ে আছে ওকে দিয়ে সে লজ্জা আমাদের কিছুটা কাটবে। আজো আমি বাজী রেখে বলতে পারি এ আশা আমরা একটুও বাড়িয়ে করি নি।

কিন্তু যা বলাছলাম, প্রথম প্রথম আমার সাহায্য দরকার হলেও পরে মাধবের আর তা দরকার হল না। শুনতাম লতিকার সঙ্গে মেলামেশা করাটা তার আর আটকাচ্ছে না। কিন্তু অতো খোঁজ কিছু আমি রাখিনি, নিজের টি স্কোয়ার আর লেদ মেসিনেই ডুবে থাকতাম আমি।

একদিন লতিকা এল হন্তদন্ত হয়ে। কপালের ওপর চুল এসে পড়েছে, চোখ মুখ অস্বাভাবিক। বললে, 'রবিদা, কি করি!'

'কেন?'

'মাধব আমাকে ছাড়তে চাইছে না যে। মাধবও যে আমাকে ভালোবেসে ফেলেছে রবিদা। আর তুমি যদি তাকাও ওর দিকে তবে দেখবে, সে ভালোবাসায় সত্যিই ফাঁকি নেই। আমি কি করি?' লতিকা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁপতে লাগল আমার সামনে বসে।

কোন লগ্‌ টেবিল দিয়ে এ সমস্যার সমাধান করব। বললাম, 'কিছুদিন সময় দিয়ে দেখো। তোমায় কে ভালোবেসেছে তা না ভেবে তুমি কাকে ভালোবেসেছো সেইটে বোঝো···।

কেঁদে কেঁদে ও চলে গেল। কিন্তু সমাধান হল না। এদিকে আমরা সবাই পাশ করে বেরোলাম। মাধব অসম্ভব ভালো রেজাল্ট করেছে। বিলেতে যাবার জন্যে একটা বৃত্তিও পেয়ে গেল। দ্বিজেনও বেশ প্রমিসিং। কলকাতার নানা মহলে ওর তখন নামডাক ছড়াচ্ছে—আগামীকালের গায়ক হিসেবে।

আমি ততো ভালো ফল করলাম না। লোহা কারখানায় একটা চান্স পেয়ে সেখানেই ঢুকলাম। যাবার আগে লতিকার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বললাম, 'লতিকা তোমাদের কি খবর বলো, আমি তো চললাম—'

লতিকা কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ কেঁদে ফেললে, 'আমি কি করব রবিদা আমি জানি না। দ্বিজেন যখন লেখে,

আমরা দুজনে মিলে এক সুরের জগৎ গড়ে তুলব—তখন আচ্ছন্ন হয়ে যাই। ভাবি তাই করি। তা পারব না রবিদা ?'

গম্ভীর গলায় বললাম, 'পারবে। নিশ্চয়ই পারবে।'

'কিন্তু মাধব যখন বলে, আমাকে বাতিল কোরো না লতিকা। আমি গাইতে জানি না। কিন্তু যন্ত্র-বাজাতে পারি। দুনিয়ায় আমিও কিছু রেখে যেতে পারি। কিন্তু তুমি নইলে আমি পারব না। তোমাকে ছাড়া আমি জীবন কল্পনাই করতে পারছি না—তখন তার কান্না কান্না মুখটাকে যে আমি কিছুতেই সইতে পারছি না রবিদা। কি করব। যদি দ্বিজেনকে বিয়ে করি ও যে সারা জীবন কাঁদবে। যদি ওকে বিয়ে করি—তাহলে দ্বিজেনের স্বপ্ন যে ভেঙে পড়বে ? রবিদা ?'

আমি বললাম আমি জানি না।

অনেকদিন আর ওদের খোঁজ রাখিনি। দশ বছর পরে একদিন একটা চিঠি পেলাম লতিকার। ও এক মফঃস্বল শহরে মেয়েদের মধ্য-ইংরেজী স্কুলে মাষ্টারি নিয়েছে। ছুটি পেলে সেখানে যেন মাঝে মাঝে যাই।

একবার গেলাম। লোহা আর ক্রেন আর ফারনেসের ঝিম-ধরা শব্দ থেকে পালিয়ে এই ছোট্ট শহরটা অদ্ভুত ভালো লেগে গেল।

লতিকার কোয়ার্টারটিও বেশ। বললাম, 'সারাজীবন এখানে থেকে যেতে ইচ্ছে করছে লতিকা।'

লতিকা হাসল।

'কিন্তু তাতো সম্ভব নয়, তোমার স্বামী এখনই তাড়া করে আসবে।'

লতিকা ম্লানমুখে বললে, 'স্বামী কোথায় রবিদা ! তুমি কোনো খোঁজ রাখো না দেখছি।' চমকে উঠলাম। সত্যিই তো লতিকার

সিঁথিতে সিঁদুর নেই। অথচ এই দশ বছরের মধ্যেও লতিকার বিয়ে হয়নি একথা সে যুগে কল্পনাই করা যেত না।

বললে, 'পারলাম না রবিদা, আজো ঠিক করতে পারলাম না, কাকে সুখী করব, কাকে কাঁদাবো।'

'এখানে তাহলে তুমি একলা ?'

'একলা থাকব বলেই এসেছিলাম কিন্তু পারলাম না। ওরাও পারল না।'

'ওরা ? তার মানে দ্বিজেন, মাধব ?'

'হ্যাঁ। দ্বিজেন আছে তার সেতার নিয়ে আলসের মতো বসে। ওর তো জমানো টাকা কিছু আছে এখনো। মাধব ভাবছে এই শহরেই কোনো একটা ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা করা যায় কি না। কিন্তু তাই কি হয়।'

'তার মানে মাধব বিলেত গেল না ? স্কলারশিপটা ছেড়ে দিলে ? অমন প্রমিসিং একটা কেরিয়ার ?'

'আর দ্বিজেনই বা কম কি রবিদা। কলকাতায় ওর কি রকম নামডাক হচ্ছিল দেখেছিলে তো। এখানে কেই বা ওকে বুঝবে।'

'আর তোমার কাব্য ?'

'ওরা যখন আসে তখন শোনে। বাকিটা তাকে তুলে রাখি। এম, ই, ক্লাসের মেয়েদের তো আর কাব্য শোনানো যায় না।'

'কিন্তু এখনো ঠিক করতে পারলে না তুমি কি করবে ?

লতিকা চুপ করে রইল। ঠিক সেই আগের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একটু কাঁদলে। আর তার সেই চুপ-করা-মুখের দিকে চেয়ে থেকে চমকে উঠলাম। সত্যিই বয়স হয়েছে লতিকার। যৌবনের দশ বছর সে খুইয়েছে।

ভদ্রলোক চুপ করলেন।

আমরা বললাম, 'তারপর ?'

'তারপর ?....তারপর তিরিশ বছর পরে এই সেদিন গিয়েছিলাম সেই শহরটায়। অন্য একটা কাজে। লতিকা আছে জানতাম না। দেখা হয়ে গেল হঠাৎ। সেই লতিকা কাব্যে যার অসাধারণ দখল ছিল এককালে। বুড়ি বুড়ি ম্লান বিবর্ণ এক দিদিমণির মধ্যে তাকে চিনে বার করতে কষ্ট হয়েছিল বেশ। বললাম, 'কেমন আছো ?'

ও হাসলো, 'ভালো।'

'দ্বিজেন ? সে কোথায় ?'

'এখানেই। গান সে অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছে। দেখা করবে ?'

সন্ধ্যায় দুজনের সঙ্গেই দেখা হল। ম্লান চেহারার একটি বৃদ্ধ : দ্বিজেন। ওর কথাবার্তা পর্যন্ত এমন গ্রাম্য, এমন অপ্রতিভ হয়ে উঠেছে যে অস্বস্তি লাগছিল। এই কি সেই আমাদের কলেজী জীবনের উদীয়মান তরুণ শিল্পী ? আর মাধব ?—সে একটা সাইকেল মেরামতির দোকান চালাচ্ছে। দাঁত পড়ে গেছে। একটা চোখে ছানি কাটানোর পর এখন নীল ব্যাণ্ডেজ বেঁধে হাঁটা-চলা করছে। আমাকে দেখে হ্যা হ্যা করে হাসল। 'আরে অনেকদিন পরে দেখা।' বললে, 'তা ভাই সাইকেল দোকানটা থেকে মন্দ হয় না—মাসে শ'খানেক হয়। চলে যায়, একলা মানুষ।'

তিরিশ বছর ! যে দ্বিজেন আর মাধবকে আমি চিনতাম তারা তিরিশ বছরের পারে দাঁড়িয়ে। তিরিশ বছর পরে যে দুই জীর্ণ মূর্তির সঙ্গে গতানুগতিক গল্প করে সারা সন্ধ্যে কাটল তাদের আমি চিনি না। চিনতে চাই না !

ওরা চলে গেলে লতিকাকে ডাকলাম। কেন যে অসহ্য লাগছিল জানি না। একী একটা প্রচণ্ড মূর্খতা ! একটা সিদ্ধান্তের অভাবে তিনটে প্রতিভা কোন ধুলোর মধ্যে এসে নামল। আমার ডাকে যে মুখ তুললে সে লতিকা নয়—একে লতিকা বলতে আমি চাই না। বর্ষীয়সী শুকনো বিবর্ণ চেহারার দিদিমণি এসে দাঁড়ানো মাত্র

পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠলাম—'কী করেছ লতিকা। মানুষের জীবন একটাই! সেই জীবন তুমি এমন করে নষ্ট করলে। প্রেম? প্রেম মানে কি এই অপমৃত্যু। তিনটে প্রতিভার এই প্রেতের মতো পরিণতি! তুমি দায়ী এর জন্যে, তুমি! আজো কি বোঝোনি, কাকে তুমি ভালোবাসো?'

লতিকা ম্লানভাবে তাকালো। এর আগে সে প্রত্যেকবার কাঁদত, কিন্তু আমার এতটা চিৎকারেও এই প্রথম সে কাঁদলে না! বললে, 'বুঝেছি রবিদা। বোধ হয় তোমাকেই ভালোবেসেছিলাম। কিন্তু মেয়ে হয়ে নিজে মুখে, সে কথা কি করে তোমাকে বলি। ভেবেছিলাম তুমি বলবে। কিন্তু তুমিও তো কখনো বললে না?'

সেই কথা শুনে সোজা পালিয়ে এসেছি। এই তাজমহলে? ভালোবাসি একথা বলার সাহস আমার কখনো হয় নি। 'আমাদের কালে হত না।'

ভদ্রলোক হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। বারোটা বেজে গেছে। গেটে ঘণ্টা দিচ্ছে বেরিয়ে যাবার জন্যে। ভদ্রলোক আর না দাঁড়িয়ে হন হন করে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের নজর এড়ায় নি। তাপে আর মেহনতে কালচে হয়ে যাওয়া মুখখানার মধ্যে টল্‌টল্‌ করছে চোখের জল।

সমীর আচ্ছন্নের মতো বললে, 'অথচ সারা জীবন ভদ্রলোক বিয়ে না করে কাটালেন।

আমরা কেউ কথা না বলে শেষবারের মতো তাকালাম তাজমহলের দিকে। আর অভিভূত হয়ে গেলাম। একী দেখছি আমরা। এতক্ষণ কী দেখেছি তাজের! এত আশ্চর্য এত অপূর্ব কখন হয়ে গেছে তাজমহল। অথচ এমন বেদনার্ত।

ভাবছিলাম বেদনা নইলে বোধ হয় কোনো কিছু কখনো সুন্দর হয় না, বেদনা নইলে সুন্দরকে চেনা যায় না। পরাশর হঠাৎ

আমার জামার আস্তিনটা টেনে ধরল—'গ্যাখ।' গ্যাখ, তাজমহল নয় সাজাহানকে গ্যাখ।

তাকিয়ে দেখি সেই ভিস্তিওয়ালা। চল্লিশ বছর আগে যে একবার প্রথম যৌবনে পায়ে হেঁটে তাজমহল দেখতে এসেছিল। চল্লিশ বছর পর মরার আগে শেষবারের জন্য দেখে যাচ্ছে। জ্যোৎস্নায় অদ্ভুত ধবধব করছে ওর নোংরা শাদা দাড়ি। বাঁকা হয়ে ফাঁক হয়ে আছে ওর ফাটা ফাটা চওড়া চওড়া পা। যেন বন্দী সাজাহান শেষবারের মতো তাজকে দেখছে।

সমীর ক্ষেপে উঠল, 'না সব চেয়ে বড়ো গল্পটা শোনা হয় নি। সেটা শুনতে হবে ওই ভিস্তিওয়ালার কাছ থেকেই।'

ভিস্তিওয়ালা আমাদের কথা শুনে শিশুর মতো হাসলে, বললে, চল্লিশ বছর আগে এসেছিলাম, আর মরার আগে এই এসেছি···'

তারপর কুঁজো হয়ে একটা বোঝা উঠিয়ে দিলে সেই রাজস্থানী বধূটির মাথায়। আস্তে সিঁড়িটুকু ধরে নামিয়ে দিলে সেই বিহারী পরিবারের বাচ্চা ছেলেটাকে। গেট পেরিয়ে হঠাৎ অত্যন্ত চেনা লোকের মতো টাঙ্গার ঝিমিয়ে-পড়া ঘোড়াগুলোর গায়ে হাত দিয়ে একটু আদর করলে, তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল যমুনার পাশের পথটা ধরে, জ্যোৎস্নার মধ্যে।

ফিরতে ফিরতে শেষবারের মতো তাকিয়ে দেখলাম তাজমহলকে। এই প্রথম মনে হল কই, সুন্দর নয়, শুভ্রতা নয়, রোমান্স নয়, বেদনা নয় তাজমহল এত মানবিক? এত সহজ!

বাদা

শীতকালের সন্ধ্যে নেমেছে সুন্দরবনের লোনা পলিমাটির উপর। দিগন্ত প্রসারী নদীর মোহনার ওপারে অনাবাদী জংলা একটা লাট। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল—নিরুচ্ছ্বাস স্ফীত গাঙের উপর দিয়ে কালো কালো বুনো হাঁসের মতো ভেসে রয়েছে দু-একটি নিঃসঙ্গ ডিঙ্গি। তারপর সহসা ঘন ভেজা একটা কুয়াশা ভেসে ভেসে উঠল চারিদিক থেকে।

গাঙের এপাশে বাঁধ-ঘেরা বিস্তৃত আবাদ। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে লোনা জল-পাতা-পচা মাটি হাসিল করিয়ে ইজারা পেয়েছিল লাটদাররা। উঁচু ঘেরি-বাঁধের আড়ালে দিগন্ত ছোঁয়া বন্ধুর কোল জুড়ে ঘন হয়ে ওঠে একটা মলিন জলজ অন্ধকার। কিছুকাল আগে অকাল বৃষ্টি নেমেছিল হঠাৎ। ভাগচাষী আর লাটদারের হিসাব চলছিল এ অঞ্চলে। কেউ কেউ ধান দিয়ে এসেছিল লাটদারের গোলায়। শুধু দুঃসাহসী দু'একজন ধান তুলেছিল নিজেদের ঘরেই। বাকী লোক কিছু স্থির করতে না পেরে মাঠের ধান মাঠেই ফেলে রেখেছিল রাগ করে, অপেক্ষা করে দেখবে বলে।

অকাল-বৃষ্টির ফলে জায়গায় জায়গায় তাদের পাকা ধান জলে ডুবে গিয়েছিল। অন্ধকারে জল-জমা জায়গাগুলো চাপা ঝিলিকে চক্‌চক্‌ করছে এখন। কুয়াশার ঝাপ্টায় মাঝে মাঝে বাতাসে ঘুলিয়ে ওঠে একটা গুমোট ধানপচা মথিত গন্ধ।

বাদার কোলে ধূসর চেহারার খাপছাড়া কয়েকটা কুঁড়ে। তারই শেষপ্রান্তে এ লাটের সব চেয়ে বুড়ো ঈশ্বর কিস্তার ঘর। প্রায়

মাটির দাওয়া পর্যন্ত নামানো জলপচা চালের উপর কুমড়ো লতার নোংরা জঙ্গল। কয়েকটা লতানি চাল থেকে খসে ঝুলে রয়েছে খানিকটা, আঙিনার একপাশে কাটা ধানের বিড়ার একটা স্বল্পকায় স্তূপ। মাড়াই হয়ে গেছে এমন কিছু ধানের আঁটি অন্ধকারে ছড়িয়ে আছে এলোমেলো হয়ে।

ঘরের ভেতর অন্ধকারে বসে বসে মাছ ধরার জাল বুনে যাচ্ছিল একটি মেয়ে। আর দাওয়ায় ঠেস দিয়ে তামাক খেতে খেতে অনবরত ফাঁপা গলায় কেশে যাচ্ছিল বুড়ো ঈশ্বর।

মেয়েটি অন্ধ! ঈশ্বরের নাতনী কামিনী, বছর চোদ্দ বয়েস। কিন্তু এখনও প্রাণে ধরে বিয়ে দিতে পারেনি ঈশ্বর। ঘরের ভেতর থেমে থেমে কথা কইছিল ওরা দুজন। কথার মাঝখানে ঈশ্বর তাড়া দিয়ে উঠছিল—'সাঁজ হৈল, ওঠ কামিনী, পথে লোক থাকবে কি না থাকবে। দৈবাৎ দেখা হৈলে কইবে কোথা চললে? কে জানে হাসাহাসি করবে না শাপান্ত করবে……'

কামিনী জালটা গুটিয়ে রাখল। বাদা থেকে ধানপচা গন্ধটা থেকে থেকে তীব্র হয়ে উঠছিল। মৃদুস্বরে কামিনী জিজ্ঞেস করলে, 'কত লোকের ধান পচে গেল। চারানি ধান পচে গেল, নয় দাদা? কিন্তু আমাদের ধান কোরোক করবেনি, নয়? আমাদের ছেড়ে দিবে, নয়?'

'ছেড়ে দিবে—আমাদের কোরোক করবেনি'……ফাঁপা গলায় ঈশ্বর আবার সান্ত্বনা দিলে কামিনীকে। সারা সন্ধ্যা ওরা দুজন এই কথাই আলাপ করছে বার বার। বুড়ো ঈশ্বর ভাঙা গলায় বার বার কামিনীকে সান্ত্বনা দিয়েছে। মনে হয়েছে অন্ধ মেয়েটা বুঝি শেষ পর্যন্ত বুঝ মানল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার কখন মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করেছে চোদ্দ বছরের মেয়েটা। সন্দেহ করেনি। আপত্তি করেনি, শুধু আরো একবার নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছে— 'আমাদের ধান কোরোক করবেনি, নয়?'

'চাদরটা গায়ে দে কামিনী....' ফাঁপা গলায় ঈশ্বর বললে অস্ফুটভাবে, তারপরে অন্যমনস্ক হয়ে থাকার চেষ্টা করে হুঁকোটা টেনে নিয়ে এল আবার, 'হারিকেনটা নিই সাথে—কি বল? উদিকে হু'লঞ্চো সিপাহী এসেছে। রাতে কুথায় থাকবে...কি জোর করবে না জুলুম করবে...'

কামিনী একটা সুতী চাদর গায়ে দিয়ে ভীরুর মতো এসে দাঁড়াল সামনে। কি ভেবে ঈশ্বর ওর কাপড়ের আঁচলটা মাথার উপর খানিকটা টেনে দিল ঘোমটার মতো করে। তারপর ইতস্তত করতে লাগল—'ওই এই বাদা! এই বাদা...চার আনি ধান ঝরে গেল চাষীদের....'

বেরোবার আগে অকারণে একটু অপেক্ষা করতে লাগল ঈশ্বর। দূরে বাদার কোণ থেকে, অনাবাদী লাটের কোণ থেকে ঝিম-ধরা আওয়াজ আসে একটানা। সন্ধ্যে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত নিঝুম হয়ে পড়ছে এই ভাগচাষী বসতিটা। আদিম জঙ্গল আর আবাদের পরিবেষ্টনে সন্ধ্যে রাতই কেমন স্তব্ধ আর নিষ্ঠুর মনে হয়। আরণ্যক নিশি প্রহরের মতো।

এমন সময় আঙিনায় কে যেন ধানের বিড়াগুলো পায়ে মাড়িয়ে এসে দাঁড়াল। চাপা গলায় ডাকলে—'ঈশ্বর-দা!'

'কে? কে?'—ঈশ্বর অলক্ষ্যে চমকে উঠলো একটু।

'আমি, ঈশ্বর-দা। চিনতে পারছ নি?'

'তুই'! ঈশ্বর কাঁপা হাতে কেরোসিন ডিবেটা উঁচু করে তুলে ধরলে আগন্তুকের দিকে। তারপর লোল ধূসর চোখে চেয়ে রইল বোকার মতো—'তুই কেদার! লোকে বলে গেরেপ্তার করে চালান দিবে তুমাকে...'

'গ্রেপ্তার করবে'...অস্পষ্টভাবে বিড়বিড় করে কথাটার পুনরাবৃত্তি করল লোকটা। সায় দিল কি বিদ্রূপ করল কথার টানে ধরা গেল না। অনেক দূর থেকে যে হেঁটে এসেছে চেহারা দেখে তা

বোঝা যায়। শীত ঠেকাবার জন্যে কান মাথা ঢেকে একটা গামছা জড়িয়েছে ; বাদা ভেঙে এসেছে হয়তো। দু পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত কাদার পাতলা প্রলেপ। মাপের আন্দাজে ছোটো একটা ছাই রঙা সুতীর হাফ-সার্ট আছে গায়ে। ঢেঙা, হাড় খোঁচা, চাষাড়ে কাঠামোটা তাতে যেন আরো তীক্ষ্ণ হয়ে ফুটে উঠেছে !

ঈশ্বরের পেছনে উৎসুক হয়ে কান খাড়া করে দাঁড়িয়েছিল অন্ধ কামিনী। হারিকেনের আলো খানিকটা পড়েছে ওর আবছা মুখের ওপর। কেদার খামোকা সেইদিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞেস করলে, 'তুমরা ধান দিয়ে এলে লাটদারকে ? থুক ফেলে থুক চাটলে তুমরা…'

অন্ধকারে কেদারের গলার আওয়াজটা শুধু কেমন ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত শোনায়। অভিযোগ নেই। জ্বালা নেই। যে সংগ্রাম আপাত পরাজয়ে ভেঙে যাচ্ছে, কেদারের ঢেঙা শরীরে শুধু তার আচ্ছন্ন রূঢ় স্তব্ধতা।

'ধান দিয়ে এলাম…' ঈশ্বর বলে অপরাধীর মতো।

অন্ধকারে দূরের পুকুরটা থেকে কেদার হাত-পা ধুয়ে আসে। তারপর নিজেই গিয়ে বসে দাওয়ার ওপর। অনেক হেঁটে আসার পর আশ্রয় পাওয়া গেলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে যেভাবে মানুষ কথা বলে, তেমনি নিঃশ্বাস ছাড়লে কেদার, 'আজ রাতটা তোমার ঘরে থাকব ঈশ্বর-দা। কুথায় আর যাই।' তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলে—'আমার ঘরটা ভেঙে দিয়েছে না ? সীল করে দিয়েছে—'

'তুই থাকবি রাতে !' কথার মাঝখানে ভীতভাবে হঠাৎ বলে উঠলে ঈশ্বর। কেদার অবাক হয়ে তাকাল ঈশ্বরের প্রকাণ্ড লোল চাষাড়ে মুখের দিকে। তারপর সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞেস করলে—'তুমরা যাবে কুথায় ঈশ্বর-দা ? লাটদারকে খবর দিবে না কি গো ঈশ্বর-দা ? সিপাই ক্যাম্পে জানিয়ে দিবে ?'

'খবর দিব !' ঈশ্বর তখনও নির্বোধের মতো চেয়েছিল কেদারের দিকে। তাড়াতাড়ি মাথা ঝাঁকাতে লাগল আর অসহায়ভাবে এলোমেলো বকতে শুরু করলে—'না, না। খবর দিবনি !···না, সে কথা নয়। কিন্তু তুই থাকবি আমার ঘরে ? এঁ্যা কেদার ?··· কিন্তু না খবর দিবনি—'

খবর দিবেনি ? সান্দিগ্ধভাবে আরো একবার জিজ্ঞেস করলে কেদার।

'দিবনি।' কেদার দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে একটা, আশ্বস্ত বোধ করে বোধ হয়। তারপর কেমন স্তব্ধ হয়ে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে ক্লান্ত পা দুটোকে গুটিয়ে আনে বুকের কাছে। শুধু হারিকেনের ঘোলাটে আলোতে ওর কর্কশ খোঁচা দাড়ি-ভরা নোংরা চিবুকটা দেখে মনে হয় একটা ক্ষুধার্ত হন্যে ভাব চাপা পড়ে কোথায়।

ঈশ্বর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর কেরোসিন ডিবেটা ঠেলে সরিয়ে রাখল একটা কোণের দিকে। বসলে কেদারের পাশে। কামিনী তখনও অপেক্ষা করছিল ঈশ্বরের জন্যে, যেখানে যাওয়ার কথা সেখানে যাবে বলে। এবার কি আন্দাজ করে সরে গেল ঘরের অন্ধকারের মধ্যে।

চমক খাওয়া কাঁপা গলায় ঈশ্বর বিড়বিড় করে যাচ্ছিল আপন মনে। হঠাৎ একটা অস্পষ্ট আবেগে কাঁপতে কাঁপতে ওর পাকা লোমে-ভরা চ্যাটালো দুই হাত দিয়ে বুলোতে শুরু করলে কেদারের সারা গা—'তুই কেদার···লোকে বলে তুই ফেরারী। কাছারিতে পুলিস এসেছে দু' লপ্তো···'

'পুলিস এসেছে····'

ঈশ্বরের ঘরের দাওয়া থেকে চোখে পড়ে সমস্ত আবাদটুকু, গাঙ আর বাদার মাঝখানে উঁচু ঘেরি-বাঁধটা ধবধব করে শাদা হাড়ের মতো। কয়েকটা ধূসর রাতচরা পাখীর মতো অন্ধকারে নিঝুম হয়ে আছে বাদার মাঝে মাঝে ভাগচাষীদের কুঁড়ে কয়টা। ভাটির

টানে গাঙে জল নেমে গেছে অনেকখানি। গাঙ আর বাঁধের মাঝখানে বানি আর কেড়া গাছের একফালি আদিম কাঁটা-জঙ্গলের কাদার মধ্যে থেকে একঘেয়ে শব্দ উঠছে একটা। বাঁধের ফাটল দিয়ে খালে খালে জল সরার শব্দ।

'তুমরা যাবে কোথায় আলো নিয়ে গো? একবার ভাবলাম.... কিন্তু কুথায় যাবে ঈশ্বর-দা, এঁ্যা? পুলিস ক্যাম্পে খবর দিবে না কি করবে। ইদিকে দেড় মাস হল ফেরার হয়ে ঘুরছি আমি। শুনলাম ঘরটা ভেঙে দিল লাটদারে। বলি, যাই দেখি একবার··· সাঁজ পহরে কি ভোর রাতে ঘুরে আসি ধার দিয়ে···'নিঝুম, ক্লান্ত গলায় কেদার জানায়।

ঈশ্বর হাঁ করে চেয়েছিল কেদারের মুখের দিকে। বোকার মতো বললে—'যাইছিল, লাটদার নিজে যাইছিল···চালের উপর এ্যাই তুই তিন লাঠি মারলে লাঠিয়ালরা। দারোগাবাবু বলল কি, না, ভাঙবনি, সীল করব। তো তালা আনল একটা। দড়ি দিয়া বাঁধল, গালা মোহর করে দিল। আর চালে গুজে দিলে লুটিসটা—'

'লুটিস?'

'হাঁ লুটিস। বলল তোর ফেরারী হওয়ার লুটিস—'

অন্ধকারে কোন সময় কামিনী ফিরে এসেছিল এক ডালা মুড়ি নিয়ে। মৃদুস্বরে ডাকলে 'দাদা—'

কেন জানি বুড়ো ঈশ্বর আবার চমকে উঠল ভীষণভাবে। তারপর অকারণে প্রবোধ দিতে লাগল কামিনীকে—না, না, ভয় নাই। ভালো লোক। কেদার আমাদের অষ্টম খণ্ডের কেদার। হাঁ, ভালো লোক—'

ভীরু গলায় কামিনী বললে, 'দুটি মুড়ি আনছি—'

হঁ, মুড়ি? খা কেদার। রাত হৈল, খা দু'টি। ভালো লোক— ভালো লোক—'

মুড়ির ডালাটা এগিয়ে দিয়ে অন্ধ মেয়েটা দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

তারপর ভীরু উৎসুক গলায় কেদারের উদ্দেশ্যে শুধাল—'ফেরারী হৈছ তুমি নয় ?'

কেদার চকিতভাবে তাকাল কামিনীর অন্ধকার মুখের দিকে। একটা চাদর ভাঁজ করে গায়ে দিয়েছে কামিনী। একটা খাটো পুরু শাড়ী পরেছে স্খলিত আনাড়ী ভঙ্গীতে। শাড়ীর ময়লা পাড়টুকু লম্বাটে হালকা পায়ের সবটুকু ঢেকে নামেনি। সোজা সোজা পাতলা চুলের ঝালরের পাশ দিয়ে গ্রীবার কাঁচা ভঙ্গীটুকু হরিণীর মতো উৎকণ্ঠিত।

'ফেরারী হইয়া ঘুরো তুমি—নয় ? লোকে কত বলে। বলে লাটদারের সাথে বিবাদ লাগাইছ তুমি—'উৎসুক আড়ষ্ট গলায় আবার জিজ্ঞেস করলে অন্ধ মেয়েটা।

'হুঁ—ফেরারী হৈয়া ঘুরি আমি। আনাড়ীর মতো জবাব দিলে কেদার।

'কত লোক যেয়ে ক্ষমা চাইল কাছারিতে।....কিন্তু তুমি ফেরার হৈয়া ঘুরো। লাটদার রাজাকে মানো নি, ধান ও দিল নি···লোকে কত বলে—'

আনাড়ীর মতো আড়ষ্ট দুর্বোধ্য কি একটা জবাব দিয়ে চুপ করে রইল কেদার। ঈশ্বর আপন মনে বলতে শুরু করে আবার—'আমি কেন খবর দিব বল ? আমি দিবনি। কিন্তু কতো রকম মানুষ আছে তো লাটে। কেউ বা চুকলি করে এল, কি কেউ পথে দেখল। তখন একটা কথা স্বীকার না করলে চলবে ? কি হাঁ, আমার ঘরে এসেছিস, কি আইসে নি—স্বীকার না করলে চলবে···?'

'কিন্তু আমি দেখতে পেলাম নি কিছুই। লোকে বলল, গাদা ধান হইছে—লাটদারকে দিবে নি। হাঁক ডাক লাগল চাষীদের। কত লোক গেল শহরে হাকিমের কাছে অত্যাচারের কথা বলতে। দল বেঁধে গেল—দিণ্ডাদের ঘরে সকলে, মাইতিদের ঘরে সকলে, পোদদের ঘরে সকলে—দেখতে পেলাম নি—'মৃদু গভীর স্বরে কামিনী

বলে। তারপর ধীরে ধীরে সরে যায় ঘরের অন্ধকার কোণটার দিকে। কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে পড়ে কেদার আর ঈশ্বর। বাদার কোণ থেকে কুয়াশায় ভেজা ধানপচা একঘেয়ে গন্ধটা ঝাপট মারে মুখে চোখে।

'ওর মা মরা হৈতে পালছি কামিনীকে। বুড়া বয়সে পালছি ওকে। লোকে বলে বিয়ে দিলিনি—এত বয়স।...কিন্তু অন্ধ মেয়েটাকে পালছি মা মরা হৈতে...'বিচলিত ফাঁপা গলায় ঈশ্বর এলোমেলো বকতে শুরু করে আবার।

'মা মরা হৈতে পালছ—'কেদার বলে নিঝুম হয়ে।

'আমরা তিনজনা ধান ছিটাইছিলি হেথায়—' ভাঙা গলায় ঈশ্বর ডুকরে ওঠে হঠাৎ। তারপর কি ভেবে চুপ করে যায়।

অন্ধকার অপ্রাকৃত বাদার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে ঈশ্বর। তারপর ফাঁপা পঙ্গু গলায় বকতে শুরু করে আবার—'ও। এই বাদা, এই বাদায় পেরথম ধান ছিটাইছিলি আমরা তিনজনা চাষী। জঙ্গল কুপিয়ে চলে গেছল ধাঙ্গড়রা, কিন্তু চাষ করতে জানতনি। মিঠানি পেলে লোনা হারে। ঘাস পাতা তিন সাল ধরে পচল। তবে সার হৈল, মাটি শক্ত হৈল—।...হরিং বরাহ বাঘ আসত গাঙ পেরিয়ে। কিন্তু আমরা তিনজন চাষী ধান বুনছিলি হেথায়—'

'হুঁ!' কেদার বলে।

'...এই লাটে যখন সেই পেরথম আসি তো ভারে করে নিয়ে আসা হয়েছিল ওর মাকে। এইটুকু মেয়া। ভারের উপর হাঁড়িকুড়ি, কাটারি, কোদাল, বোড়া, সকলি চাপিয়ে লিয়ে আসা হয়েছিল।...ছুদিন মিঠা জল পাইনি কুথাও। কিন্তু হাসতেছিল ওর মা...।'

'ওহ! অন্ধ হয়ে রইল মেয়াটা...'

'অন্ধ! দেখতে পায়নি। কিন্তু দেখতে পেত আগে। কিন্তু ওই উনপঞ্চাশ সন!...না খেয়ে ফুলে ওই বাদায় পড়ে চড়চড়ে হয়ে গেল ওর মায়ের মরা দেহ। খিদের জ্বালায় কি খেয়েছে কি খায়নি

বিষ পাতা না লোনা ঘাস—সেই হতে আস্তে আস্তে দিষ্টি কমে গেল মেয়াটার....'ঈশ্বর বলে নির্বোধের মতো। তারপর হাঁ করে চেয়ে থাকে দুর্বোধ্য ভঙ্গিতে।

'দেখতে পেত আগে!' ঈশ্বর পুনরাবৃত্তি করে কথাটার।

প্রশস্ত গাঙের ওপারে অন্ধকারে জলবন্দী জঙ্গলটা ঠাহর করা যায় না এখান থেকে। একটা দমকা সামুদ্রিক হাওয়া ওঠে কোথায়। জঙ্গলের গাছপালাগুলো থেকে চাপা শন্‌শন্‌ শব্দ ভেসে আসে গাঙ পেরিয়ে। কিছুক্ষণ উসখুস করে হঠাৎ লুব্ধের মতো ঈশ্বর জিজ্ঞেস করলে—'সব ধান তুই তুলেছিলি নিজের ঘরে? সব ধান?'

'তুলেছিলাম' নিঝুম হয়ে কেদার উত্তর দিলে।

'কিন্তুক দেড়ি বাড় কি যা হোক কিছু ভাগ দিলিনি লাটদারকে?

'কিছুই না।'

'কিছুই না!' লুব্ধের মতো ঈশ্বর পুনরাবৃত্তি করলে কথাটা। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল উৎসুক হয়ে। তারপর সচকিত হয়ে উঠল হঠাৎ—'হেই কেদার! সাহস কোথা আমাদের! সাহস কোথা? সারা বছর মানুষ দেখা যাবেনি এ সুন্দরবনে। কিন্তু ধান উঠেছে তো লৌকা করে চলে আসতেছে সকলে। লাটদার, নায়েব, সিপাহী, বেপারী সকলে চলে আসতেছে লৌকা করে...'

কেমন স্তব্ধ, একঘেয়ে শোনায় ঈশ্বরের স্থবির গলার আওয়াজ। গাঙ মোহানা আর পচা পলিমাটির পরিবেষ্টনে এই হতভাগা আবাদের সমস্ত আদিম অভিশাপ মোচড় দেয় ঈশ্বরের ভাঙা ফাঁপা হতাশ কণ্ঠস্বরে। খালে খালে ভাঁটির জল সরার মৃদু অসহ্য শব্দটা যেন গোঙাতে থাকে একটা পঙ্গু যন্ত্রণায়। বহুক্ষণ ধরে গোঙায়। অন্ধকার কুড়েটার ভেতরে তিনটে প্রাণী চুপ করে থাকে অস্বস্তিতে।

'মাইরী, কেমন ডাগর হয়ে গেইছ কামিনী!' নিঝুম হয়ে বসে থেকে আচমকা বলে ওঠে কেদার। ঈশ্বর থতমত খেয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে হাঁ করে।

'দেখতে পায়নি। কিন্তু কতো ডাগর হয়ে গেছে মাইরী!'

ভীত গলায় ঈশ্বর ডাকলে—'কেদার!'

'ঘর কোথা আর আমার! লুটিস রেখে গেছে চালের খুঁটে। ফেরারী হয়ে ঘুরছি।...দেড় কুড়ি বয়স হৈল আমার। হাঁ, স্বীকার করব! কিন্তু তেমন টাকা পইসা না দিলে কে কন্যে দিবে এ সুন্দরবনে—'

অন্ধকারে ক্ষুধার্ত মোহাচ্ছন্ন ভঙ্গিতে কেদার কথা বলতে শুরু করে, কোনদিকে দৃকপাত না করে।

'কেদার!'

'কন্যে তুলব তার ঘর কুথা'। এক হাল জমি করতিছি কতো সাল। হাল জমি কেড়ে লিবে এবার, উচ্ছেদ করবে। মাইরী, কতো ডাগর হয়ে গেছে কামিনী! তিন কুড়ি টাকা পণ দিব ঈশ্বর-দা—যেমন করে পারি শুধব বছরে বছরে—'

ভীত অসহায় ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাতে শুরু করে ঈশ্বর—'হেই কেদার! কিছু শুধাসনি। তুমাকে বলতে পারবনি। কিন্তু ঘর সংসার করা হবেনি তুমার—'

সন্দিগ্ধভাবে ঈশ্বরের মুখের দিকে চাইল কেদার—'কন্যে দিবে না বলতিছো ঈশ্বর-দা?'

'হেই কেদার, কিছু শুধাস নি। তুই ফেরারী গোঁয়ার। লাটদার তুমাকে ছাড়বেনি। উৎখাত করবে, বসতে দিবেনি এই লাটে...'

'কন্যে দিবেনি তাহলে—?'

হঠাৎ নিতান্ত বালকের মতো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল কেদার,—'দিবেনি ঈশ্বর-দা—?'

কাতরভাবে মিনতি করলে ঈশ্বর—'হেই কেদার, কিছু শুধাস নি আমাকে—' তারপর আতঙ্কে আনাড়ীর মতো ধাক্কা দিতে লাগল কেদারকে—'তুই চলে যা কেদার। অতিথ তুই। মুড়ি দিলি, জল

দিলি। কাউকে বলবনি তুই এসেছিলি, লাটদার পুলিস কেউ জানবেনি—তুই চলে যা কেদার—'

স্থির নিষ্ঠুর গলায় কেদার বললে 'যাবনি। কি মতলব তুমার ঈশ্বর-দা ?'

'যাবি না ?'

'না।'

দূরে বাদার কোণ থেকে প্রহর ডাকল একদল শেয়াল। কয়েকটা রাতচরা পাখি বোধ হয় ঝটপট করে উড়ে গেল পচা ধান গাছগুলোর মধ্য থেকে। আপন মনে শিউরে উঠল ঈশ্বর। কামিনীকে তাড়া দিয়ে এল একবার। তারপর কেদারের দিকে না চেয়ে বকতে লাগল ফাঁপা গলায়—'পহর ডাকা হয়ে গেল। দেরী হয়ে গেল। কিন্তু যেতে হবে। না গেলি ছাড়বেনি···তাড়াতাড়ি কর কামিনী। ওহ্ এই বাদা···পহর রাত হয়ে গেল···'

'কি মতলব তুমার ঈশ্বর-দা ; কুথায় চললে ?'—ক্ষিপ্তের মতো বুড়ো ঈশ্বরের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল কেদার।

ঈশ্বর কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল কেদারের দিকে। তারপর কাতরভাবে পা জড়িয়ে ধরল কেদারের— 'হেই কেদার! তুই ফেরারী গোঁয়ার! কিন্তু বলব তুমাকে। কেনে বলবনি।···কি করব। কাছারিতে চললাম আমরা—'

'কাছারিতে চললে!'

কেদারের পায়ের ওপর একটা ধাড়ী জানোয়ারের মতো যন্ত্রণায় লুটোপুটি খেতে লাগল ঈশ্বর—'হেই কেদার! ভয় পাইল অষ্টম-খণ্ডের চাষীরা। কিন্তু লুকাবনি তোমার কাছে। ধান কোরোক করে নিলে লাটদারে। কিন্তু নায়েব বললে, ঈশ্বর তুমাকে বাঁচিয়ে দিব। মেয়েটাকে দিয়ে আসিস কাছারিতে। ওই অন্ধ কানা যে গো বাবু। না—, হোক, দিয়ে আসিস রেতে—। তুমার কাছে লুকিয়ে রাখবনি—'

ভূতের মতো হেসে উঠল কেদার—'তাই এত রেতে সাজগোজ করিয়ে লিয়ে চললে কামিনীকে—'

কেদার গর্জিয়ে উঠল—'থামো ঈশ্বর-দা!'

ঈশ্বর টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। আতঙ্কিত নির্বোধ একটা পশুর মতো হাঁ করে চেয়ে রইল এই হন্যে চেহারার ফেরারী মানুষটার দিকে। তারপর কাঁপা গলায় ডাকলে কামিনীকে—'আয় কামিনী… কেদার তুই চলে যা—'

ঈশ্বরের কথা মতো বাঁশের ছড়ির ওপর ভর করে আঙিনায় ঠুকঠুক করে কয়েক পা এগিয়ে গেল কামিনী।

ক্ষেপার মতো কেদার ছুটে গেল কামিনীর কাছে। জোয়ান দুই হাত প্রসারিত করে বেপরোয়ার মতো। 'দিবনি যেতে ঈশ্বর-দা। জোর কোরো নি। লয়ত ঘর নাই দুয়ার নাই আমার, কিন্তু লিয়ে পালাব যেথাকে খুশি—'

'কেদার!'

'না না, ছাড়বনি—'

'তুই অতিথ কেদার, জল দিলি, মুড়ি দিলি—পুলিস ক্যাম্পে খবর দিই নি—'

'না—'

হঠাৎ মরিয়া হয়ে উঠল ঈশ্বর। আতঙ্কিত চাপা চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল কেদারের ওপর।

হাঁপাতে হাঁপাতে দুই হাতে হিংস্র কিল মারতে শুরু করলে আথালি-পাথালি—'শালা বোম্বেটে! শালা—সর্বনাশ না করে ছাড়বেনি—না গেলে ঘর জ্বালিয়ে দিবে লাটদারে—উৎখাত করবে শালা বোম্বেটে।'

—'শালা বুড়োর রোখ দেখো—'

থতমত খেয়ে প্রথমে খানিকটা পিছিয়ে গেল কেদার। তারপর সচকিত হয়ে তীব্র ঘৃণায় ক্যাঁতক্যাঁত করে লাথি মারলে কয়েকটা।

রাগের মাথায় কামিনীর হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এল পেছনে।

আর্তনাদের মতো অস্পষ্ট অর্ধোচ্চারিত একটুখানি শব্দ করে সহসা চুপ করে গেল কামিনী। ধাক্কায় উল্টে পড়ে গিয়েছিল কেরোসিনের ডিবেটা। কয়েক মুহূর্তের জন্যে একটা আদিম জংলা অন্ধকার আছড়ে পড়ে মানুষ কয়টার মাঝখানে। কাঁটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে খালে খালে লোনা জল সরার মৃদু শব্দটা হিংস্র মনে হয় কেমন।

'লিয়ে চলে যাব তুমাকে, লিয়ে যাব অন্য কুথাও'—কেদার বললে চাষাড়ে ক্ষেপা গলায়।

'কেদার! কেদার!'

পেছনের অন্ধকারে ভাঙা ফাঁপা গলার আওয়াজ ভেসে এল আবার। দড়ি-ছেঁড়া একা মোষের মতো ছুটতে ছুটতে আসছে ঈশ্বর। হুড়মুড় করে ঈশ্বর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল কেদারের উপর—'না গেলে ঘর জ্বালিয়ে দেবে সিপাইরা—'

নিষ্ঠুরভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে আরো কয়েকটা লাথি মারল কেদার। একটা অথর্ব ঘৃণ্য জন্তুর মতো ঝটকা মেরে ঠেলে ফেলে দিলে ঈশ্বরকে—'শালা!'

কিন্তু মরিয়ার মতো আবার টলতে টলতে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল ঈশ্বর—'তুই রক্ষা করতে পারবি আমাকে? শালা ডাকাত!··· ঘর জ্বালিয়ে দিবে লাটদারে—'

কেদার এবারেও লাথি মারার জন্যে রুখে উঠেছিল। হঠাৎ থেমে গেল। তীব্র ঘৃণায় থুতু ফেলল কয়েকবার—'যাও! ছেড়ে দিলাম তুমাদের—'

হাঁপাতে হাঁপাতে নির্বোধের মতো জিজ্ঞেস করলে ঈশ্বর,

'ছেড়ে দিলাম। লিয়ে যাও কাছারিতে। থুক ফেলে থুক চাট যাও—'

কয়েকবার থুতু ফেললে কেদার। কোনদিকে তাকাল না। আস্তে আস্তে ভেড়ি-বাঁধের ওপর গিয়ে উঠল। তারপর নিচে নেমে গেল বাদার মধ্যে। কুয়াশা আর পচা ধান গাছের মধ্যে দিয়ে পথ করে এগিয়ে যাচ্ছে—আক্রোশে বকতে বকতে, অভিশাপ দিতে দিতে।

বহুক্ষণ মাটির ওপর স্তব্ধ হয়ে বসে রইল ঈশ্বর। উঠে দাঁড়িয়ে নেভা কেরোসিন ডিবেটা পর্যন্ত জ্বালালে না। বাদার কোল থেকে ঘাস-পচা মথিত গন্ধটা একটা নিষ্ঠুর গুমোট সৃষ্টি করে রেখেছে কেমন। গাঙের কোলে কাঁটা জঙ্গলের মধ্যে সরসর শব্দ করে নড়াচড়া করছে হয়ত বন-শুয়োরের একটা দল।

হঠাৎ কান্না-ভাঙা গলায় বিলাপ করতে লাগল ঈশ্বর—'ভালো লোক, ভালো লোক। ক্ষেমতা আছে—বিবাদ করতে পারে লাটদারের সাথে····ভালো লোক—'

কামিনী চুপ করে ছিল সারা ঘটনাটা। পাথরের মতো চুপ করে ছিল চোদ্দ বছরের নির্বোধ অন্ধ মেয়েটা। এবার দুর্বোধ্য চিৎকার করতে লাগল চাপা বিকৃত গোঙানির মতো একটা আওয়াজ করে—'আঁ—আঁ—আঁ—'

—তিন চার সাত দশ এগারো এদের ব্রোমাইড ছিল না?

দিয়েছি।

ওয়ার্ড বয়টা কোথায়, ৮-বিতে অক্সিজেন দিতে হবে যে।

—গীতা গেছে দিতে।

—টেম্পারেচার নেওয়া হয়ে গেছে সব?

হয়েছে, হয়েছে, সিস্টার, সব হয়েছে! আধুনিকা মুখরা ট্রেনিং নার্স শোভা খস্‌খস্‌ করে ডিরেকশন লিখতে লিখতে অনায়াসে মুখ ঝামটা দেয় স্টাফ সিস্টার সুবালার ওপর। সুবালা বোঝে, কিন্তু কিছু বলে না, কিছু বলতে সাহস পায় না এই সব একালের নতুন মেজাজের নতুন সব ছুঁড়িগুলোকে। গুণের মধ্যে এই যে দু-এক পাতা ইংরেজী পড়েছে কেউ কেউ। কেউ কেউ ম্যাট্রিক পাশ করেছে, কলেজ পর্যন্ত ঘুরে এসেছে। কিন্তু পেশা তো সেই নার্সিং-ই, নাকি লেডি ডাক্তারি? সেই এক যুগ আগে পেটে বিদ্যে না থাকলেও সুবালাদের যা করতে হয়েছে সেই ট্রেনিং? নাকি অন্যকিছু? মনের মধ্যে একটা ভোঁতা রাগ অনুভব করে সুবালা, তবু কিছু বলতে সাহস পায় না। শুধু অভ্যেস মতো নিজেই একবার করে বেডগুলো ঘুরে দেখে আসে, কারো বেডের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়ায় কারো স্যালাইন বোতলটা ঠিক করে দেয় একটু, তারপর আবার বিব্রতের মতো ফেরে এই শোভার কাছেই: ওদিককার লাইট দুটো অফ করে দিয়ো তা হলে।

ঘুরতে ঘুরতে সুবালা গিয়ে দাঁড়ায় করিডরে। সেখান থেকে তাকালে দেখা যায় হাসপাতালের বিল্ডিংগুলো থেকে কেমন একটু আলাদা হয়ে পাপের মতো মোহিনী হয়ে উঠছে ছোট্ট একটু পথ, দুধারে তার দেবদারু গাছের কানাকানি আর তার ফাঁকে ফাঁকে ঝাপসা কয়েকটা মূর্তি—নারী আর পুরুষ। পুরুষেরা কে সুবালা জানে না, নারীগুলো কে তা জানে। ওই নার্স—ওই একালের মেয়েরা সব। দেখতে দেখতে অসহ্য লাগে তার। অস্থিরের মতো পালিয়ে আসে সুবালা। ৮-বি থেকে গীতা আর ওয়ার্ডের মাঝখানে ডিরেকশন লেখার জাবদা খাতাটার সামনে বসা শোভা ইতিমধ্যে চোখ মটকে হাসাহাসি শুরু করে দিয়েছিল। যেন ইশারায় এ ওকে বলছিল, 'ছাখনা! মুট্‌কী আজো আবার গিয়ে দাঁড়িয়েছে করিডরে! এবার এসে আবার ঘ্যানঘ্যান শুরু করে দেবে: কখন ঘণ্টা বেজে গেছে। কোয়ার্টারের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, অথচ ছাখো মেয়েগুলোকে—সুবালা ঘুরে আসতে ইশারাটুকু থামল, কিন্তু ঠোঁটের ওপর বিদ্রূপের হাসির রেশটুকু মুছে নেবার চেষ্টাটাও বিশেষ ওরা করে না।

এমনি প্রত্যেক দিন। এমনি অনায়াস নির্লজ্জতায় ওরা হাসবে সুবালাকে শুনিয়ে শুনিয়ে। সেই হাসি দেখে গাটা রী রী করে ওঠে সুবালার। প্রত্যেকবারই ভাবে চটে উঠবে, রিপোর্ট করবে। কোনো একটা খুঁত ধরে রিপোর্ট করার অধিকার তার আছে। কিন্তু ওরাও জানে, সুবালাও জানে, অধিকার থাকলেও ক্ষমতা তার নেই। ওর রিপোর্টের কেউ মূল্য দেবে না, শুধু ওপর তলায়, ব্লক সিস্টার আর মেট্রনদের রুমে আরো একটু হাসির উপকরণ যোগাবে মাত্র। অথচ পদমর্যাদায় সে এদের চেয়ে উঁচু: এরা ট্রেনী ও স্টাফ। কিন্তু সে জন্যে নয়। শুধু সেই জন্যে কোনো সম্মান সুবালা এদের কাছ থেকে চায় না। ট্রেনিং শেষ হলে এরাও তো স্টাফ হবে, আর স্টাফ হলেও যে কি

সুখ তা তখন বুঝবে। সে জন্যে নয়। কিন্তু অন্তত বয়সের জন্যে সে যে এদের একযুগ আগে এসে ঢুকেছে, সে যে এই খলবলে চটপটে মুখরা মেয়েগুলোর মা-মাসীদের সমবয়সী অন্তত এই জন্যেও কি এরা তাকে একটু সম্মান করতে পারত না? অন্তত একটু মুখের ভদ্রতা?

কিন্তু সেটুকুও ওরা করবে না। কেমন যেন একটা স্পর্ধা উঁচিয়ে এসেছে এই একালটা, কেমন একটা বেহায়া নির্লজ্জতা বয়ে নিয়ে এসেছে ওই মেয়েগুলো। সুবালাকে দেখে ওরা হাসে। এতদিনকার নার্স হওয়া সত্ত্বেও ডাক্তারদের, প্রফেসরদের সঙ্গে কথা কইতে হলে আজও যে সুবালা নার্ভাস হয়ে পড়ে, কল্ বুকে এক কলম লিখতে হলে কলম ভাঙে, তা দেখে প্রকাশ্যে ঠাট্টা করতেও ওদের বাধে না। তার চেহারা, চালচলন, কথাবলার ঢঙ এ সব কিছুতেই ওদের রগড় যেন উথলে ওঠে। সুবালা কতোদিন স্পষ্ট শুনেছে, ওকে উদ্দেশ্য করে ওর পেছনে হেসে গড়িয়ে পড়েছে মেয়েগুলো, ছ্যাখ, ছ্যাখ, হাতের মাদুলিটায় মুটকী নতুন সুতো লাগিয়েছে আবার…'

মুটকী মানে সুবালা। তার কালো মোটা, অনাধুনিক অ-চতুর চেহারাটা ওরা এককথায় সারার্থ করে নিয়েছে মুটকী। তার মধ্যে এতটুকু শ্রদ্ধা নেই, এতটুকু সহনশীলতা। শুধু এদের কাছেই বা কেন, কার কাছেই বা সে পেল? লাঞ্ছনার এক আতঙ্কিত জীবনের ধাক্কা খেয়ে সে একদিন এসে ঢুকেছিল এই হাসপাতালে। হিন্দু গেরস্ত ঘরের বৌ নার্সগিরি করবে, কেউ ভাবত না তখন। সুবালাও কি ভেবেছিল। তার বাপের বাড়ি তার শ্বশুরবাড়ি সকলের কাছেই সেটা ছিল ভারি ঘেন্নার কথা। দাঁতে দাঁত চেপে এই ঘেন্নার জীবনেই পা বাড়াতে হয়েছিল সুবালাকে। স্বামী ছিল পর, হয়ত এখনো আছে। সে ভদ্রলোক যদি কোনো দিন মারা যায়, আর যদি সে খবর সুবালা পায় তাহলে এখানে সে কপালের সিঁদুর মুছে ধর্মসম্মতভাবে যা যা করা দরকার তা করবে। বাঁ হাতের কনুয়ের ওপর এখনো যত্নে রেখে

দিয়েছে সেই চামড়া-কেটে-বসা সুতোয় বাঁধা একগোছা দৈব মাদুলি যার গুণে স্বামী পরিত্যক্তার স্বামী ফিরে পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেই কবে, কোন এক হারিয়ে যাওয়া অতীতের বাসরঘরে সুসজ্জিত অপরিচিত একটি লোক হয়ত নেহাত করুণাভরে তার রূপহীন সঙ্কুচিত দেহটাকে একটু অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করে তারপর যে মুখ ঘুরিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে মুখ আর সুবালার দিকে কখনো ফেরেনি।

সুবালা তার জন্যে নিজের কপালকে ছাড়া আর কাকে দোষ দিতে হবে জানত না। বাপের বাড়িতে ফিরে এসেছিল। সেখানে ভাইয়েদের আর ভাই বৌদের বাঁকা মুখ সহ্য করেই হয়ত জীবন কাটাত। কিন্তু বেকার ন ভাইটা ওকে জোর করে এনে ঢুকিয়েছিল নার্সিং-এ। অন্য ভাইরা কেউ তখন বিশেষ আপত্তি করে নি, কিন্তু কয়েকবার বাড়িতে আসতেই সুবালা টের পেয়েছিল এতদিন সে ছিল ভার, এখন অস্পৃশ্য। বাঁকা মুখের বদলে এখন অন্য কি একটা বাঁকা কৌতূহল ওদের মুখে ফুটে উঠেছে, স্পষ্ট করে কেউ না বললেও সুবালা জানত তার নাম ঘেন্না।

শুধু সেই রোগা বাউণ্ডুলে ন ভাইটা তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে কেমন উত্তেজিতভাবে বলেছিল, ও কিছু নয়রে সুবালা কিছু নয়! ওদের ঘেন্নায় কিছু এসে যাবে না। শুধু নিজের পায় দাঁড়াস। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বাঁচা ওদের চেয়ে অনেক সম্মানের....

ও বাড়ির সেই খাপছাড়া ভাবুক ভাবুক ছেলেটা কোন এক অজ পাড়াগাঁয়ে কিসের হুজুগে গিয়ে মুখে রক্ত উঠে মারা যাবার পর সুবালা আর তার বাপের বাড়িতেও যায় নি। কিন্তু শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি আর বাপের বাড়ি থেকে এই হাসপাতাল—কোনটার থেকে কোনটা কতোটুকু বেশি সম্মানের তা সে আজো বুঝে উঠতে পারে নি। শুধু এইটুকু সে ধরে নিয়েছিল, এ সংসারে মেয়ে হয়ে জন্মেছে তারওপর যার রূপ নেই তেমন গুণও নেই তাকে সহ্য করতে হবে।

যেখানেই সে থাকুক শুধু একটি উপায়ে সে বাঁচতে পারে—সহ্য করে।

হাসপাতালেও তাকে বাঁচতে হয়েছে সহ্য করে। লোকে বলেছিল বটে, এখন তো অনেক ভালো। ভদ্রলোকের মেয়েরাও কতো ঢুকছে, কতো হিন্দু মেয়ে। সে যুগের সেই 'কতো' যে কতোটুকু মাত্র তা সুবালাকে টের পেতে হয়েছে ঠোঁট কামড়ানো চোখের জলে! সে যুগে চারিদিকে তখনো শুধু শাদা কালো মেমসাহেবের আসর। উটকো দু-চারজন সাঁওতালী, খাসিয়া, মাদ্রাজী মেয়ে যারা এসেছে ক্রীশ্চান মিশনদের কাছ থেকে তাদেরকেও মেমসাহেবের কোঠায় ধরে রেখেছিল সুবালা। বাঙালী যারা তারাও বেশীরভাগ ক্রীশ্চান। ডাক্তার, মেট্রন নার্স আর এই শাদা কালো ফিরিঙ্গি মেয়েদের ভিড়ে তারা যতো সহজে মিশে যেতে পারত সুবালা তা কখনো পারে নি। তারা যতো সহজে ইংরেজী বুঝতো সুবালা তা বোঝেনি, যতো সহজে উত্তর দিতে পারত সুবালার তা কখনো কুলোয় নি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডিউটি দিতে দিতে আর পদে পদে ভুল করে, পদে পদে আনাড়ীপনা দেখিয়ে বড়ো ডাক্তার, ছোটো ডাক্তার, বড়ো সিস্টার, ছোটো সিস্টারে, স্টুডেণ্ট, রোগী এমন কি ওয়ার্ডের জমাদারদের কাছ থেকে ধমক সহ্য করে এক একটা দিন কেটেছে সুবালার। আর তারপর···তারপর শুধু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতেই নয় এ করিডর থেকে ও করিডরে যেতে, অকারণে হেল্প করতে ডাকার সুযোগে অথবা নাইট ডিউটির নির্জন মুহূর্তে আচমকা গল্প করতে আসা কোনো উচ্চপদস্থের অশোভন ঘনিষ্ঠতাই শুধু নয়—এমনকি কোয়ার্টারেও গভীর রাত্রে হঠাৎ শোনা যেত বারান্দায় অস্ফুট কথাবার্তা; থমথমে জুতোর পুরুষালি শব্দ! দু-চার টাকা বরাদ্দ বকশিশ নিয়ে বিনা দ্বিধায় দরজা খুলে দিয়েছে দারোয়ান। দু-একটা প্রেজেণ্টের বিনিময়ে এক রাত্রির শয্যাভাগ করে নেওয়ার মতো মেয়ে নার্সদের মধ্যে নেই, একথা সাহস করে সেই কি বলতে পারত?

জুতোর শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে বহুদিন আতঙ্কে উঠে বসেছে সুবালা। তার ঘরে আসবে? যদি আসে? আসা কিছু বিচিত্র নয়। কেন না এলেও সেটা এ রাজ্যের মানদণ্ডে স্ক্যাণ্ডেল বলে গণ্য হবে না। নালিশ করলেও সেটা হোমসিস্টারের কুটিল হাসির সীমানা ডিঙোতে পারবে না। যদি তার রুমেও টোকা পড়ে?

কিন্তু সে শুধু আতঙ্ক। সুবালার ঘরে কেউ কোনোদিন ঢোকে নি। বছরের পর বছর কাটিয়েছে সুবালা কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে না। শুধু একদিন—প্রেতায়িত সেই রাতটার কথা সুবালা কখনো ভুলবে না। হঠাৎ একসঙ্গে অনেকগুলো জরুরী কেস এসেছিল সেদিন। বোধ হয় সেই বেয়াল্লিশের হাঙ্গামার সময়। এক নাগাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝাড়া দশঘণ্টা ধরে অপারেশন করে চলেছে ইংরেজ প্রফেসর ডাঃ কিথ। তাকে এসিস্ট করে যাচ্ছে সমানে হালে বিলেত থেকে ফেরা মাতাল সেই ডাক্তারটা—চৌধুরী। আর ওয়ার্ডের মধ্যে শিফট শেষ হয়ে যাবার পরেও আটকা থাকতে হয়েছে সুবালাদের। এক একটা কেস রিসিভ করে সঙ্গে সঙ্গে বেডের ব্যবস্থা করা, স্যালাইন, ব্লাডের বোতল নিয়ে ছোটাছুটি করতে হিমসিম খেয়ে যেতে হচ্ছিল ওদের। তারপর ডাঃ কিথও আর পারলেন না। দস্তানা এ্যাপ্রন খুলে টলতে টলতে চলে গেলেন কোয়ার্টারে। আরো বেশ কয়েকটা কেস তখনো বাকি। অপারেশন না হলে হয়তো কয়েকটা মরবে। মাতাল চৌধুরীটা কি ভেবে যেন ক্ষেপে উঠল 'কামঅন্ আমি করব।' 'পেশেণ্ট অন্ দি টেব্‌ল।'

তখন রাত কতো ঠিক মনে নেই সুবালার। ওয়ার্ড থেকে যখন সে ছুটি পেলে তখন শরীর তার চলছে না। নিঝুমের মতো ও সেই দেবদারু গাছে ছাওয়া রাস্তাটা দিয়ে হেঁটে ফিরছিল কোয়ার্টারে। হঠাৎ দাঁড়াতে হল তাকে। চারিদিককার ওয়ার্ডের আলোগুলো তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখের মতো আধ বোজা। সমস্ত চত্বরটা কেমন নেশাগ্রস্ত,

ঘুমন্ত। ফিকে ফিকে ছায়ায় দেবদারুর পথটা অসম্ভব নির্জন। সেই নির্জন ছায়ায়, গাঢ়তর আর একটা ছায়া টলতে টলতে আসছে। সেই লম্বা হাড়খোঁচা মূর্তিটাকে একবার দেখলেই আর কেউ ভুলবে না—ডাঃ চৌধুরী। ডাক্তারকে পথ করে দেবার জন্য সুবালা পথের পাশে দাঁড়িয়েছিল একটু। কিন্তু ডাক্তারও দাঁড়াল। বোঝা যায় এক নাগাড়ে আঠারো ঘণ্টা গাধার মতো খেটে এখন আবার এক পেট মদ টেনেছে চৌধুরী। জড়িতস্বরে আপন মনে সে বিড়বিড় করছিলঃ হেল্ অব এ জব্। ওয়াক্। দে উইল স্যুট্ পেট্রিয়টস্—হেল্ অব ইট, আই ওয়াণ্ট্ এ গার্ল নাও—ইয়েস এ গার্ল! আর ইউ এ গার্ল?

সুবালা সব কথা বুঝেছিল কিনা কে জানে কিন্তু শেষের কথাটা বুঝেছিল। ভয়ে বুক হিম হয়ে এসেছিল তার। কিন্তু কি করতে পারে সে? কিছুই করতে পারে না।

'কাম অন্…' চৌধুরী সুবালার হাতটা নিজের শক্ত হাতের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে কোন একটা দিকে যেন হাঁটতে শুরু করেছিল। হাঁটতে হাঁটতে আবোল-তাবোল বকেছিল। এলোমেলোভাবে সুবালার শরীরটা নেড়ে-চেড়ে দেখেছিল। কিন্তু তার বেশি কিছু করে নি। গেটের কাছটায় বড়ো আলোটার সামনে এসে হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে ডাক্তারটা চোখ কুঁচকে সুবালার রূপহীন মুখখানার দিকে প্যাটপ্যাট করে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

তারপর ব-র-র করে মাতাল বিরক্তির কি একটা শব্দ করে হেঁটে চলে গিয়েছিল একা একাই।

'গার্ল!…বাই গ্যাড্। ওয়াট এ ক্রিচার। ড্যাম ইট্। আই উড্ রাদার…

কিন্তু যদি না যেত? তাহলে সুবালা জানে সে প্রতিরোধ করতে পারত না। প্রতিরোধ করার কথাই কেউ ভাবতে পারত না। খুবই খারাপ যুগ ছিল সেটা। নরকের মতো একটা যুগ। কিন্তু তাই বলে

এ-কালের এই মেয়েরা ? এরাই বা কিসে ভালো ? সুবালা জানে উপায়হীনা সেদিনকার মেয়েরা নিজেরা খারাপ ছিল না। খারাপ ছিল ব্যবস্থা। নিজেরা এগিয়ে যেত না। এগিয়ে আসত সেরা ডাক্তাররা, স্টুডেন্টরা, এমন কি গণ্যমান্যেরা পর্যন্ত। মুখ বুজে না সয়ে তাদের উপায় ছিল না, কিন্তু এ মেয়েরা ?

এ মেয়েদের সুবালা চেনে না। শুধু আজো যখন ডাক্তারদের সঙ্গে কথা কইতে হলে আদিম এক আতঙ্কে সুবালার বুক কাঁপে তখন অবাক হয়ে সে দেখে এই একালের ছুঁড়িগুলো অনায়াসে জবাব দিচ্ছে; ভুলও করে অনায়াসে, বলছে ভুল হয়েছে, নিজেরাই এগিয়ে ডাক্তার স্টুডেন্টদের সঙ্গে ছোটোখাটো ইয়ার্কিও দিচ্ছে···যেন নার্স নয়, সমান সমান কেউ !

এ থেকে একটা কথাই সুবালা বুঝেছে ঃ আগে পাপ ছিল কিন্তু মেয়েগুলো এমন বেহায়া ছিল না, এমন কি ফিরিঙ্গি মেয়েগুলো পর্যন্ত নয়। এখনো পাপ আছে, উপরন্তু মেয়েগুলো—হিন্দু ভদ্র ঘরের মেয়েগুলো পর্যন্ত হয়ে উঠেছে কেমন খাপছাড়া রকমের বেহায়া।

অথচ বলতে যাও, এর ওর দিকে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে ওরা আচমকা খিলখিল করে হেসে উঠবে, কোথায় পাপ ? আপনাদের সময় যা ছিল, ওকথা আর বলতে আসবেন না।

আর সুবালা পেছন ফিরলেই স্পষ্ট শুনতে পাবে ওরা রগড়ে ফেটে পড়তে চাইছে ঃ 'এই আস্তে শুনতে পাবে' 'বুঝতে যে ছাই পারি না' ওই নার্সের পোষাকের মধ্যে ওই অতগুলো মাদুলি মুটকী পরে কি করে যে···'

সুবালা কথা বাড়ায় না। তাড়াতাড়ি পালিয়ে বাঁচে। হঠাৎ মনে হয় সে বড়ো পুরনো হয়ে গেছে, বড়ো বাতিল। একদিন ছিল, যখন সে ছিল বড়ো নতুন বড়ো কাঁচা। এই অপরিচিত জগৎটা সে-দিন পদে পদে তাকে আঘাত করে উপহাস করেছে। তারপর ভালো

করে বুঝতে না বুঝতেই এক সময় দেখা গেল, কোন সময় সে বাতিল হয়ে যেতে শুরু করেছে। অপরিচিত জগতটা পরিচিত হতে না হতেই আবার অপরিচিত হয়ে উঠেছে এইসব নতুন আগন্তুকদের ভিড়ে। এরা কেউ ফিরিঙ্গি নয়, শাদা কালো মেমসাহেব নয়, তারই মতো গেরস্ত ঘরেরই মেয়ে, অধিকাংশ আবার কুমারী, তবু কি অপরিচিত। সেদিনও সে ছিল একলা, আজো একলা। সেদিন তবু আশা ছিল একদিন প্রতিষ্ঠিত হবার। আজ শুধু আশঙ্কা নতুনেরা তাকে ঠেলে বাতিল করেই বুঝিবা যায়।

তবু ওর মধ্যে একটি মেয়েকেই কেমন ভালো লেগে গিয়েছিল সুবালার। কেমন একটা মায়া মায়া বেদনা অনুভব করেছিল বুকের কোন একটা কোণে। এ মেয়েটিরও নাকি স্বামীর ঘর করা হয়নি। কিন্তু শুধু সেইজন্যেই তার মন টেনে ছিল তা নয়। এমন মেয়ে তো তার এই চল্লিশ বছরের জীবনে কতো দেখেছে সুবালা। কিন্তু কারো সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা শেষ পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। কিন্তু এই মেয়েটি জয়া, হঠাৎ একদিন একমুহূর্তে তার মন কেড়ে নিয়েছিল। ওয়ার্ডে সেদিন ছিল খুব চাপ। ট্রেনিং-এর মেয়েগুলো হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল। সুবালা তাই তার যথাসাধ্য শক্তি দিয়ে সামলাবার চেষ্টা করছিল। সব ঠিকঠাক হয়ে যাবার পর জয়া হঠাৎ একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে একটু লজ্জা লজ্জা করে, 'সুবালাদি, আপনি যে এত খাটতে পারেন, ভাবিনি কখনো।'

সুবালা মুখ তুলেছিল তার সেই সতর্ক আশঙ্কাভরে। ভালো মানুষের মতো যখন কেউ তার সঙ্গে কথা বলে তখন তা কেবল পরমুহূর্তেই একটা প্রাণঘাতী রহস্যের ভূমিকা রচনার জন্য এটা সুবালা এতদিনে জেনে ফেলেছে। কিন্তু আশ্চর্য জয়া প্রশংসা করল, এবং সে প্রশংসা অকৃত্রিম।

'মাঝে মাঝে এত কষ্ট হয় জানেন সুবালাদি। এত যন্ত্রণা। ভাবি খুব করে খাটাব ঠিক আপনার মতো। কিন্তু তারপর ঐ সব

মেট্রন, ডাক্তার, সুপারদের একের পর এক নিয়মকানুন জাল জোচ্চুরি দেখে ভারি বিছ্ছিরি লাগে। ভাবি দূর···। এই তো আপনি খেটে মরেন দেখিতো। কিন্তু কে পোঁছে আপনাকে ?'

সুবালা অবাক হয়েছিল। সে যে খেটে মরে তা সে নিজেও কখনো ভেবে দেখেনি। ডাক্তারদের সামনে কথা কইতে না পারলেও রোগীদের এতটুকু কষ্ট লাঘবের জন্য সে যে কিছু না ভেবে কেমন করে কাজে ডুবে যায় তা প্রথম সে শুনল এই জয়ার কাছে। তারপর ভারি আপন মনে হয়েছিল মেয়েটিকে, ভারি সুন্দর।

সেই জয়াকেই একদিন সুবালা জানিয়েছিল তার নালিশ, এই কি ভালো ? একালের মেয়েগুলো যা হয়ে উঠেছে সেই কি ঠিক। এত বেহায়াপনা, এত পাপ····

কিন্তু জয়া পর্যন্ত খিলখিল করে হেসে উঠল, কোথায় বেহায়া, কোথা পাপ ?

নয় ? সুবালা বিড়বিড় করে টানতে টানতে নিয়ে এসেছিল জয়াকে। দোতালায় করিডরে। সেখান থেকে দেখা যায় সেই দূরের দেবদারু ছাওয়া পথটুকু। সারা হাসপাতালের অসুখ-বিসুখ, যন্ত্রণা রুগ্নতা, ব্যাণ্ডেজের কাপড় আর ওষুধের গন্ধ সবকিছু থেকে এই পথটুকু রাত হলেই কেমন যেন আলাদা হয়ে বেরিয়ে আসে এক ফালি নিষিদ্ধ কবিতার মতো ! 'ছাখতো তাকিয়ে—'

পাখির চোখের মতো ভীরু ভীরু আলোয় ছায়া ছায়া হয়ে ওঠা পথটার দিকে জয়া খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। ঝাপসা ঝাপসা দেখা যায় এক-একটা গাছের এক-একটা ছায়া ঘেঁষে ঘেঁষে কয়েক জোড়া মেয়ে পুরুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। রোজই করে। মেয়েরা অধিকাংশই নার্স কিংবা ট্রেনিং গার্ল। পুরুষেরা হয় ছাত্র নয় তরুণ কোনো ডাক্তার, নয় বাইরের কেউ। ঘণ্টা পড়ে যায়, গেট বন্ধ হবার সময় তবু তারা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গল্প করে, তাদের গল্প যেন আর ফুরোতে চায় না।

'দেখছো?' সুবালা গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল।

কিন্তু জয়া—অমন মায়া পড়ে যাওয়া মেয়েটি পর্যন্ত সুবালার মুখের ওপর হি হি করে হেসে উঠেছিল—'তাতে কি হয়েছে। এর মধ্যে খারাপ কি দেখলেন। যারা গল্প করছে তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই ভালোবাসা আছে। তাতে খারাপ কি।'

জয়া হাসতে হাসতে তার হালকা হাই-হিল জুতোর টুকটুক শব্দ তুলে হাসের মতো যেন ভেসে চলে গিয়েছিল তার ওই বেহায়া সঙ্গীদের কাছে, হাসতে হাসতে খিলখিল করতে করতে। আর সুবালা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিল পেছন থেকে সেই অনির্দিষ্ট বিশ্লেষণটা মুটকী! মুটকী কে নিয়ে···

তবু বেশীদিন মেয়েটার ওপর রাগ পুষে রাখতে পারে নি সুবালা।

কে যেন সেদিন খবর দিয়েছিল, জয়াকে নাকি ফিরিয়ে নিতে এসেছে তার স্বামী। জয়া ডিউটিতে ছিল, ডে ডিউটি। ডাক্তারদের রাউণ্ড শেষ হয়ে গেছে। খুব যে চাপও ছিল তাও নয়। আলসের মতো জানলায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ষ্টিমে দেবার জন্যে স্যালাইন বোতলে ভরছে। কিন্তু বোতলে ভর্তি করার চাইতেও বোধ হয় অবসরটুকু ভরে তুলছে ডাঃ রায়ের সঙ্গে গল্পে। পাশের টেবলে বসে গলায় ষ্টেথেস্কোপ নাড়াচাড়া করতে করতে ডাঃ রায় মাঝে মাঝে হেসে উঠছে। মাঝে মাঝে জয়ার মৃদু মেয়েলী হাসিও মিশে যাচ্ছে তার সঙ্গে। কোনো দিকে ওদের যেন খেয়াল নেই। স্বামী যে এসেছে সে খবরটাও যেন জয়া পায়নি। ডিউটির মধ্যেও জয়াকে ছেড়ে দেবার এক্তিয়ার আপাতত সুবালার, তবু হুঁশ নেই জয়ার।

শেষ পর্যন্ত সুবালাই নিজে গিয়ে তাড়া দিয়েছিল জয়াকে, 'তোকে যে নেবার জন্যে লোক এসেছে জয়া···উঠবি না। যা ছেড়ে দিলাম একঘণ্টা···'

'উঠব?' জয়া কেমন লঘু করে দিতে চেয়েছিল কথাটা। ডাঃ রায়ের দিকে ফিরে বলেছিল, 'তাহলে যাই···'

আর বুক তুরতুর করে কেন জানি অপেক্ষা করেছিল সুবালা। তাকে ফিরিয়ে নেবার জন্যে কেউ আসেনি কোনোদিন, আসবেও না। কিন্তু তবু যেন দায়টা সুবালারই, সুখটা সুবালারই।

একঘণ্টা পরে জয়া ফিরেছিল অন্যমনস্কের মতো। মুখটা কেমন রক্তাভ, উচ্ছ্বসিত।

'কি হল রে? কবে যাবি তাহলে?'

জয়া অন্যমনস্কের মতো কোমরের বাঁধা বেলট্‌টা আরো একবার বাঁধার চেষ্টা করেছিল। তারপর হঠাৎ উত্তর না দিয়ে খামকা টেম্পারেচার ট্রেটা তুলে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় একটা যে কোনো বেডের কাছে।

'কি হল বললি না?'

'সুবালাদি, আপনি এত সুন্দর কাজ জানেন, অথচ ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন না কেন?'

'আমি ভাবছি···আপনার কাছ থেকে শিখে নেব। ও ক্লাসে যা শেখায় তাতো দেখছি, মাগো অত সাত জন্মেও আমি পাশ করতে পারব না····।'

'ওসব কথা রাখ। কিছু বলছিস না যে।'

'কী আবার বলব। দেখা করতে এসেছিল দেখা করলাম। আর আসবে না।'

'ফিরে যাবি না তাহলে!'

'কেন যাবো? আমিই তো ইচ্ছে করে চলে এসেছি। এতদিন ধরে কি ভেবেছে কে জানে। বলছে চলো। ভালোবেসে তো আর আসেনি। এসেছে ওর অপমান হচ্ছে বলে। বন্ধুবান্ধবরা আড়ালে টিটকিরি দিচ্ছে বলে।'

'তাই বলে স্বামী !···সে নিজে এল নিতে !' সুবালা হতবাক হয়ে তাকায় এই একালের মেয়েটার দিকে। আঃ, এতক্ষণকার অন্যমনস্ক সুবালা হঠাৎ আশ্চর্য স্বাভাবিক হয়ে যায় কেমন করে। মুখ ছাপিয়ে তার এবার ফুটে উঠতে চায় সেই গা জ্বালা-করা রহস্যের হাসি। খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলে ওঠে, 'তাতে অবাক্ হবার কি আছে ? হলই বা !' আর একালের টুকটুক করা হালকা জুতোর শব্দ তুলে হাঁসের মতো ভাসতে ভাসতে চলে যায় করিডরের দিকে। ডাঃ রায় সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে।

আর তা দেখে সারা মনটা সুবালার ছি ছি করে উঠেছিল। জয়ার জন্যে যে কোমলতাটা ইতিমধ্যে ফিরে আসছিল সেটা হঠাৎ পালটে যায় দ্বিগুণ পরিমাণ বিরূপতায়। একে বেহায়াপনা বলবে না তো বলবে কাকে। সুবালা জানে উচ্চপদস্থেরা এগিয়ে আসতে পারে নার্সদের দিকে। তখন রক্ষা পাওয়া মুশকিল। সে ক্ষেত্রে যে রক্ষা পায় না, তাকে তবু ক্ষমা করা সম্ভব। কিন্তু যে মেয়েরা সেধে যেচে এমন করে এগিয়ে যায় উচ্চপদস্থ পুরুষদের দিকে, তাদের ?

ডিউটি শেষের পর সুবালা সেদিন ধরেছিল জয়াকে, 'এটা কি ? এর কি মানে হয় ?'

জয়া তেমনি কৌতূহলের ভুরু তুলেছিল, 'কিসের সিস্টার ?'

'ডাঃ রায়ের সঙ্গে অমন মেলামেশা অথচ স্বামীটা···'

ঠিক তেমনি খিলখিল করে হেসে উঠেছিল, 'বাঃ, ডাঃ রায় যে আমার বন্ধু ! সময় থাকলে ভাই ওঁর সঙ্গে একটু গল্প করি···'

বন্ধু ? সুবালা বোঝাবার চেষ্টা করেছিল জয়াকে, তাই কখনো হয় ? যে পুরুষেরা হুকুম করে আর যে মেয়েদের সে-হুকুম তামিল করতে হয় তাদের মধ্যে শুধু একটা সম্পর্কের কথাই সুবালা জানে।

বন্ধুত্ব আবার কি ? যারা হুকুম করে তারা মানবে কেন ? কিন্তু তাতে সুবালাকে হতভম্ব করে অনায়াসে জানিয়েছিল জয়া, 'না মানলে চলবেই বা কেন ?'

এর পরে আর কথা চলেনি। কিন্তু জয়ার একটি কথাও সুবালা বিশ্বাস করেনি। একটি কথাও বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। জয়া যতই সহজ দেখাবার চেষ্টা করুক, ডাঃ রায়কে সুবালা লক্ষ্য করেছে সভয়ে। এক যুগ আগে থেকে সে যা দেখে এসেছে তাতে সে প্রতিকার করতে পারেনি, কিন্তু নির্ভুলভাবে ধরতে পারে কোন ডাক্তারটা, কোন পুরুষটার মধ্যে কখন পশু জেগে উঠছে।

আর ডাক্তার রায় যে কেন হঠাৎ রাত দুপুরে অন্য ওয়ার্ড ছেড়ে এই ওয়ার্ডে আসে টেথেস্‌স্কোপ ফেলে গেছে কিনা দেখতে, কেন যে নির্লজ্জের মতো সুবালাকেই জিজ্ঞেস করে জয়া কোথায়, কেন যে সুযোগ পেলেই গা ঘেঁষে দাঁড়ায় জয়ার তা তো একটা কচি মেয়েও বলে দিতে পারবে।

তাছাড়া আর বলা কি স্বচক্ষেই তো দেখা। ও গীতা বানীরাই সেদিন দেখিয়েছিল। 'সুবালাদি আসুন—একটা জিনিস দেখে যান !'

সুবালা ভেবেছিল কোনো পেশেণ্টের কোনো কিছু ট্রাব্‌ল্‌। কিন্তু ওরা টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল দোতলার সেই করিডরের কোণটায়। 'দেখছেন ?'

সেই অভিশপ্ত দেবদারু গাছের পথটুকু। কানে কানে বলা কথায়, ভীরু ভীরু ছোঁয়ায় মোহিনীর মতো মায়াময় হয়ে কার জন্যে যেন অপেক্ষা করে আছে। আর সেই ছায়ায় ঝাপসা ঝাপসা হলেও দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে শাড়ির রঙে স্পষ্ট ঠাহর করা যায় জয়াকে। আর জয়ার সামনে, প্রায় গায়ের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে কে ও ? কে ? ডাঃ রায় ? কোট প্যাণ্ট ছেড়ে পাঞ্জাবি পরে এসেছে নাকি ? কিন্তু অমন হাড় খোঁচা দেখাচ্ছে কেন রায়কে ?

সুবালা আর জয়ার সঙ্গে কথা বলেনি তারপর। হঠাৎ মাঝে মাঝে এমন মন কেড়ে নেয় মেয়েটা। কী রকম আপনার লোকের মতো সুর এনে বলে, আপনি একটু কাজ শিখিয়ে দেবেন সুবালাদি। ও টিউটর সিস্টারের বক্তৃতা শুনে পাশ করতে পারব না। পারবেই না তো। মরো। তাতে সুবালার কি? এই মেয়েরা স্থির হোক একটু। সে যুগের মতো কাঁদুক ঠোঁট কামড়ে অপমান চেপে এপাশ ওপাশ করুক নিজের বিছানায়। তাতে সুবালা খুশীই হবে।

আর সত্যি সত্যিই যেন ভগবান সুবালার এই একটি ইচ্ছা পূর্ণ করাই ঠিক করেন। স্থির করে বসলেন।

খলবল করে কথা কওয়া, খুটখুট করে হাঁসের মতো ভেসে চলা, উনিশ থেকে চব্বিশের সহজ স্পর্ধায় সবকিছুতেই চোখ মুখ ছাপিয়ে রহস্যের দমকা হাওয়া বইয়ে দেওয়া মেয়েগুলো হঠাৎ থিতিয়ে আসতে লাগল। নতুন কে এক মেট্রন এসেছে—সে নাকি কি একটা ব্যাপারে হঠাৎ রেগে গিয়ে ডিসিপ্লিন আনার কথা ঘোষণা করে দিয়েছে। ট্রেনিং মেয়েদের আর নিঃশ্বাস ফেলার যেন সময় নেই।

নিঃশ্বাস না ফেলে খাটতে সুবালার কোনদিনই কিছু মনে হয়নি। তাই তো নিয়ম। নইলে টাকা দেবে কেন ওরা। কিন্তু এই কাঁচা আনাড়ী মেয়েগুলোর মধ্যে ত্রস্ত ক্লান্ত গুঞ্জন ওঠে, ডিসিপ্লিন না ছাই। গাদাগাদা পেশেণ্ট আসছে, ফেরাতে পারছে না। যে কটি মেয়ে আছে তাই দিয়েই কাজ চালাতে হবে তো। কেন নার্সএর সংখ্যা বাড়াও।

কথা মিথ্যে নয়। সুবালা দেখেছে অন্যান্য ব্যবস্থা আগে যা ছিল তাই প্রায় সব ঠিক আছে অথচ বছরের পর বছর রোগীর চাপ বাড়ছে। যে ওয়ার্ডে পনেরোটা বেড আরো থাকার কথা, সেখানে বেডের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকছে কুড়িটা খাটিয়া, স্থায়ী অস্থায়ী আরো পঁচিশটা নম্বর। তাতেও কুলায়নি—যাওয়া আসার করিডরগুলো

পর্যন্ত ছেয়ে গেছে বেড়ে। আর এই চাপ 'ম্যানেজ' করার জন্যে কর্তৃপক্ষ আর কিছু না বাড়িয়ে জনকয়েক বেশী মাইনের ব্যবস্থাপক নিয়ে আসাই যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন। জনকয়েক এ্যাডিশনন্থাল সুপার মেট্রন ইনচার্জ। অথচ তার ফলে প্রেসারের কষ্টটুকু ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে শেষ পর্যন্ত সবখানি এসে চেপে বসেছে ওই সেই মুষ্টিমেয় ট্রেনিং মেয়ে, আয়া আর গোঁ-ধরা ওয়ার্ড বয়গুলোর ওপর। ওপর তলায় ইস্ক্রুপ আঁটার সঙ্গে সঙ্গে শুধু বড় মেট্রন নয়, মেজো, সেজো, ব্লক সিস্টার ডাক্তার—সকলেরই মেজাজ কড়া হতে শুরু করেছে অধস্তন আর অধস্তনতমদের ওপর সর্বোপরি নার্সদের ওপর।

স্টাফ সিস্টার সুবালারও খাটুনি কম পড়ে নি। তবু খাটতে খাটতে চোখ তুলে তাকিয়ে যখন দেখা যায় চৈত্রের রোদে-পোড়া দেবদারুর পাতার মতো কেমন ধুলো ধুলো বিবর্ণ হয়ে এসেছে এই একালের খলবলে বেহায়া মেয়েগুলো, তখন মনে মনে একটু তৃপ্তি না পেয়ে সে পারে না। ভাবে জয়াকে ডেকে একবার বলবে নাকি, 'কি জয়া, ডাক্তার রায়ের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার সময় হচ্ছে না আর, দেখনা এই বার বন্ধুতা করে···'

কিন্তু বলা আর হয় না। এই চাপের মধ্যে এই ক্লান্তির মধ্যেও হঠাৎ দেখা যায় জয়া কেমন করে একটু সময় করে নিয়েছে, ঠিক গিয়ে দাঁড়িয়েছে ডাঃ রায়ের পাশে, হাতে একটা কাগজ, হাসছে না কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে কি যেন বলছে, হাসছে ডাঃ রায়। ডাঃ রায় হো হো করে হেসে অতি অনায়াসে জয়ার গায়ে ঢলে পড়ে বুঝিবা।

হঠাৎ চমকে উঠল সুবালা—কি হয়েছে? যেন সাপের গায়ে-পা পড়ার মতো ছিটকে এসেছে ডাঃ রায়। আর সাপিনীর মতোই ধকধক করছে জয়ার চোখ দুটো। কিন্তু সে শুধু মুহূর্ত মাত্র। রোগীর ভিড়ে কাজের চাপের মধ্যে আবার স্বাভাবিকের মতো

হারিয়ে যায় জয়া। হিলের শব্দ আর টুকটুক ছন্দ তোলে না, ক্লান্তিতে ঢ্যাবঢ্যাব করে।

কিন্তু স্বাভাবিক হয় না ডাক্তার রায়। দাঁতে দাঁত চেপে ইংরেজীতে কি যেন বিড়বিড় করে। তারপর গ্যাঁটগ্যাঁট করে হেঁটে গিয়ে কড়া ধমকের সুরে একটার পর একটা হুকুম করতে শুরু করে 'নার্স! ড্রেসিং ট্রলি......' নার্স! স্টাফ্! স্টাফ্! কই কোথায় স্টাফ্!

যে পেশেন্টকে দেখছিল তাকে ফেলেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতে হয় সুবালাকে, একটু নির্বোধের মতো একটু নার্ভাসের মতো উচ্চ পদস্থের সামনে চিরকাল সে যেমন একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ে তেমনি অপ্রতিভের মতো।

'কই স্টাফ্! ক-ম্-প্লেন্ বুক! এই করে কাজ করতে পারে কেউ? কই, কী বললাম? কম্প্লেন বুক! ওঃ, দিস্ হরিবল্ মুটকী!

সুবালা তবু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে রায়ের দিকে। ডাঃ রায়ও তাকে মুটকী বলল! সবার সামনে! এটা কি গালাগালি? হ্যাঁ গালাগালি। কিন্তু ওযে ডাক্তার। ডাক্তাররা কিছু করলে কি করতে হয় সুবালা জানে না। সইতে হয়? হ্যাঁ সইতে হয়। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে চেয়ে থাকে সুবালা।

ডাঃ রায় দ্বিতীয়বার খেঁকিয়ে উঠতে যাবে, হঠাৎ তার চেয়েও তীক্ষ্ণ চেরা গলায় কে যেন চেঁচিয়ে ওঠে পেছন থেকে 'শাট আপ্। আপনি কোন সাহসে আমাদের সিস্টার না বলে নার্স বলে ডাকছেন। কোন সাহসে...ওকে গাল দেবেন কিন্তু পারেন ওর মতো খাটতে, পারেন ওর মতো ইনজেকশন দিতে...কোন সাহসে?'

জয়া আর কথা কইতে পারে না।

আবেগে গলা আটকে যায় তার। সারা ওয়ার্ড এক মুহূর্তে নিঃশ্বাস বন্ধ করে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। তিনটি ট্রেনিং নার্স, দুটো

রেফুজি আয়া, আর এলোমেলো কয়েকটা জমাদার, ওয়ার্ড বয়, ঘেঁষাঘেঁষি করে আসে পরস্পর।

'মেমোরাণ্ডামটা তখন দিয়েছিলাম সই করার জন্যে। সই করল না কিছুতে। বললাম, কেন অন্য ডাক্তারেরাও তো সই করছে। না! উপরওয়ালাকে চটাতে চান না উনি আর আমাদের বলবে মুটকী! আমরা নিজেদের মধ্যে যাই বলি না কেন ওঁর কি রাইট আছে সেকথা বলার?' জয়া হাঁপাচ্ছিল তখনো। রায়ের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে যখন কথা কইছিল জয়া তখন তাহলে ওই কাগজটাকেই দেখেছিল সুবালা।

কিন্তু কি শুনছে সুবালা? আমাদের! 'সুবালা ও ওদের!' তাকে অপমান করাটাও ওদের অপমান। কিন্তু কেমন করে। জয়ার দিকে ভালো করে এতদিন পর তাকায় সুবালা। খাটতে খাটতে শুকিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। চৈত্রদিনের বিবর্ণ দেবদারুর মতো। তবু তার পাতাগুলো কেমন রুখে ওঠা সোজা, মাথা উঁচু করা। এই কি একালের মেয়ে?

মেমোরাণ্ডামটারই ফল কিনা কে জানে। অনেক লোকের এক সঙ্গে অতগুলো স্বাক্ষরের মধ্যে কোনো মন্ত্র আছে কি না কে জানে—ওপরতলার ইস্কুপটা থামল একটু। কয়েকটা দাবি মানা হল, কয়েকটার জন্যে প্রতিশ্রুতি। কয়েকটা বাতিল। আর মুখে কিছু না বললেও ওপর থেকে, ভেতর থেকে, পাশ থেকে সন্ধানী সতর্ক কয়েকটি দৃষ্টি স্থির রইল কি যেন একটা ছুর্যোগের অপেক্ষায়।

তা থাক। এক ওয়ার্ড থেকে আর-এক ওয়ার্ড, এক সিঁড়ি থেকে আর-এক সিঁড়ি, এক বিল্ডিং থেকে আর-এক বিল্ডিং—খুশীর একটা চাপা বিদ্যুৎ ছড়িয়ে পড়ল—যেন এই বেহায়া মেয়েগুলোরই চোখ মুখ ছাপিয়ে উঠা অন্য আর-একটা আরো বড়ো হাসির চাপা ঝিলিক।

কাজের চাপ যথেষ্ট না কমলেও আবার হিলের শব্দে উঠল খুট-খুট পাখির ছন্দ—সাজের ঢেউয়ে উঠল ভেসে যাওয়া হাঁসের দোলা। আর রাত্রে রোগীদের খাওয়া-দাওয়া ইনজেকশন্ ওষুধ সব হয়ে যাবার পর লাইট অফ করে দেবার পর বেড়ে বেড়ে ভিড়াক্রান্ত করিডরের একটা কোণে দাঁড়িয়ে সুবালা দেখল—স্বপ্নের মতো ছায়া সেই দেবদারু সারি ছায়া—অথচ হঠাৎ কেমন নতুন লাগে সব কিছু।—সেই জোড়ায় জোড়ায় একালের এই নতুন মেয়ে পুরুষ দাঁড়িয়ে—কথা ওদের ফুরোতে চাইছে না, তবু কেমন নতুন।

সেই জয়া আর জয়ার গা ঘেঁষে পাঞ্জাবি-পরা ঘাড় খোঁচা সেই মূর্তিটা। সে মূর্তি তার স্বামী নয়, ওপরওয়ালা ডাঃ রায় নয়, অন্য কেউ? কে?

হঠাৎ চমকে ওঠে সুবালা। পেছনে ডাঃ রায়। গালাগালি দিচ্ছে না—কিন্তু শ্বাপদের মতো একটু হাসি লেগে আছে তার ঠোঁটের কোণে: 'দেখেছেন সিস্টার। আপনি সাক্ষী রইলেন। কোয়ার্টারের গেট কখন বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ জয়া বাইরে কথা বলছে একটা লোফারের সামনে। আ্যাই নো হিম্। এখানে পেশেণ্ট ছিল কিছুদিন—ছাঁটাই বাস কণ্ডাক্টর। এর আগেও অনেকদিন দেখেছি, কিছু বলিনি···কিন্তু দাঁড়ান আপনি সাক্ষী···।

নিঃশব্দে ডাঃ রায় চলে যায়। নিঃশব্দে ফিরে আসে একেবারে খোদ মেট্রনকে নিয়ে 'সী দিস্ ইজ স্ক্যাণ্ডালাস্ এণ্ড সি ওয়াজ দি রিঙ লীডার অব দ্যাট ট্রাব্‌ল্···'

'ইয়েস! সব চেয়ে মৃদু আর সব চেয়ে ভয়ঙ্কর গলায় মেট্রন ডাকলে, 'বয়, এ নোট হোম সিস্টার কো পাশ দে দেনা···'

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায় সুবালা। থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে সে। অদ্ভুত আনাড়ী একটা আবেগে জীবনে প্রথম সে প্রতিবাদ করে উঠল—'না!'

'তার মানে?' মেট্রন অবাক্ হয়ে তাকায় এই নিরীহতম কুরূপা মেয়েটির দিকে। 'না, না মেট্রন না! ওরা যে ভালোবাসে!'

গলার স্বর সুবালার আশ্চর্য দৃঢ় অথচ দুই চোখ তার কখন ভরে উঠেছে এক দুর্বোধ্য চোখের জলে 'ওরা যে ভালোবাসে মেট্রন, ভালোবাসে!'

গান্ধারী

মেডিকেল কলেজে পড়ি। ছুটিতে ছুটিতে বাড়ি যাই। বাড়ি মানে মফস্বল জেলার একটা শহর। বাড়ি যাই আর আশ্চর্য লাগে। যে শহরটাতে বড় হয়ে উঠেছি, সেটা আসলে এত তুচ্ছ, মামুলী এত পেছিয়ে পড়া ছিল নাকি কখনো ?

শহরটা হয়ত যা ছিল তাই আছে, হয়ত বা একটু এগিয়েছে। কিন্তু আমাদের মন এগিয়ে এগিয়ে চলেছে তার চেয়ে অনেক দ্রুত একটা গতিতে। তাই এক একবার ছুটিতে শহরে আসি, আর এক এক পোঁচ ম্লান হয়ে যায় শহরটা, এক এক ডিগ্রি তুচ্ছ। ছেলেবেলায় মোড়ের যে ঝুপসি গাছটা দেখে বিস্ময়ে চোখ ভরে উঠত, এক ছুটিতে এসে চোখে পড়ল তার মধ্যে এতটুকু অসাধারণ কিছু নেই—নিতান্ত মাঝারি আকারের একটা ধুলো-ভরা বট। মেথর পাড়ার যে বদরাগী ভয়াবহ মাতালটাকে দেখে পাড়াসুদ্ধ সকলে বার বার ভয় পেয়েছি, আর মনে মনে অসুরের মূর্তি কল্পনা করেছি, এক ছুটিতে এসে মনে হল সে একটা নিতান্ত গ্রাম্য বিনীত বৃদ্ধ লক্ষ্মীছাড়া মাত্র। তাকে দেখে করুণা ছাড়া আর কোনো ভয়াবহ অনুভূতির অবকাশই হবে না।

শহরের সবচেয়ে বলবান লোকটা, সবচেয়ে সুপুরুষ বাবুটি, সব চেয়ে মাননীয় মাষ্টারমশাই—বছরের পর বছর এঁরা সকলেই আমাদের চোখে এক এক পোঁচ ম্লান, এক এক ডিগ্রি করে মামুলী হয়ে উঠতে লাগলেন। আমাদের কষ্ট হত, তবু মেনে নিয়েছিলাম এই হবে, কেন না আমরা তখন এক এক ডিগ্রি করে এগিয়ে চলেছি।

ফলে মা-মণিকে দেখে সেই ছেলেবেলার যা যা মনে হত, পরে যে আর তা মনে হবে না, সেটা জানা কথা। তবু ছুটিতে এলেই মা-মণির সঙ্গে একবার করে দেখা না করে যেতাম না। তাঁর রান্নাঘরের সামনে পিঁড়ি পেতে বসতাম, চা খেতাম কাঁসার গেলাসে। ওঁদের বাড়িতে চিনেমাটির কাপ বড়ো একটা থাকত না।

আর গল্প করতাম। মা-মণি নিজে যেমন গল্প করতে ভালোবাসতেন, তেমনি শোনার মতো গল্প পেলেও ছাড়তেন না কখনো। বলতেন, 'তোরা তো আজকাল কলকাতার লোক। নতুন কি সিনেমা দেখলি বল না।'

নতুন দেখা যা-কিছু, নতুন আইডিয়া যা-কিছু যথাসাধ্য মা-মণিকে শোনাতাম। অতি আধুনিক কোনো একটা ইংরেজী ফিল্ম কিংবা অতিখ্যাত কোনো একটা ফরাসী উপন্যাসের গল্প শুনিয়ে বলতাম, জানো মা-মণি, দুনিয়াটা ভয়ানক এগিয়ে যাচ্ছে। লোকে আর, বানাতে চায় না, সত্যি করে বলতে চায়।'

'কিন্তু এ তোদের কি সত্যি হলরে বীরু? যে গল্প বললি তার মানে তো এই যে ভালোবাসাটা আসলে ভালোবাসা নয়, নিতান্ত স্বার্থপর একটা প্রবৃত্তি? এ কী রকম সত্যি? এ সত্যি জেনে লাভ কি?'

আমি ডাক্তারির ছাত্র। ডাক্তারি প্রমাণ দিয়ে জানাতাম, 'রকম-টকম বুঝি না, লাভ লোকসানের কথা নয় কিন্তু এই-ই হল বিজ্ঞানের আবিষ্কার। বিজ্ঞানকে গাল দাও কিংবা গ্রহণ করো, সেটা বিজ্ঞানই।'

মা-মণি বলতেন, 'হয়ত তোদের কথাই ঠিক। কিন্তু সব সত্যি তোরাই জেনে ফেলেছিস বলতে চাস? আর হলেই বা সত্যি। সত্যিই কি সব? আমি যদি না মানি?'

মা-মণি তর্ক করতেন, কিন্তু কিছু না জেনে। সেই অনেক কাল আগে যা জেনেছিলেন যা শিখেছিলেন সেইটুকুর জোরে। তারপর

না পেরে, উঠে যেতেন সংসারের এটা ওটা কাজে। কোলের মেয়েটাকে দুধ খাওয়ানো হয় নি। তার বড়োটা ধুলোর মধ্যে গড়াচ্ছে। বড়ো ছেলে মাট্রিক পাশ করার পর থেকে বাড়িতে বিশেষ থাকে না। মাঝখানের ছেলেমেয়েগুলো পড়ার নামে এর ওর সঙ্গে খুনসুটি করে চলেছে অনবরত।

আর তখন, অসহ্য মামুলী মনে হত মা-মণিকে। অসহ্য রকমের পেছিয়ে-পড়া এক গ্রাম্য মাষ্টারের মধ্যবয়সী স্ত্রী মাত্র। সংসারের অনটন আর একগাদা ছেলেমেয়ে ছাড়া আর কোনো ভাবনা ভাবার ক্ষমতা যার নিঃশেষ হয়ে গেছে অনেকদিন। অথচ এই মা-মণিকে আমরা একদিন কী চোখেই না দেখেছিলাম।

ইংরেজীর নতুন মাষ্টার এসেছিলেন প্রমথবাবু। যা পড়াতেন সব কিছুই অপূর্ব লাগত। স্কুলের পড়া ছাড়াও তাঁর বাড়িতে আমরা হানা দিতাম দলবেঁধে। কিছু দিনের মধ্যেই দেখা গেল প্রমথবাবুর চেয়েও বড়ো আকর্ষণ আছে প্রমথবাবুর বাড়িতে ঃ মা-মণি।

প্রমথবাবুকে আমরা ডাকতাম স্যার বলে। প্রমথবাবুর স্ত্রীকে কি বলে ডাকা যায় আমরা ভেবে পাই নি ঃ গুরুমা ? কাকীমা, মাসীমা ? কোনোটাই ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না। মা-মণিই বললেন, 'শোনো, গুরুমা-টুরুমা নয় বাবা। কি বিচ্ছিরি সেকেলে ডাক। তোমরা বরং আমাকে মা-মণি বলে ডেকো, কেমন ?'

ডাকার মতো এমন সুন্দর একটা নাম আমরা এর আগে কখনো শুনিনি। উল্লাসে আমরা চেঁচিয়েছিলাম, 'ঠিক তো ! কি সুন্দর নাম। মা-মণির বুদ্ধি ছাড়া এসব আর কারো কাছ থেকে বেরুবে না।'

আমাদের কাছে মা-মণি ছিলেন যা কিছু সুন্দর, যা কিছু আধুনিক তারই প্রতীক।

আমাদের যেতে দেখলে মা-মণি একটা না একটা কবিতার লাইন বলে আমাদের অভ্যর্থনা করতেন আর সব কবিতা রবীন্দ্রনাথের।

যাবো বলে কোনোদিন যদি যেতে দেরি হত, তো দেখতাম মা-মণি ঠিক দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়। আমাদের দেখে সুর করে বলে উঠতেন, 'ঘণ্টা বেজে গেছে কখন অনেক হল বেলা…'

বাইরের ঘরে অতিথি অভ্যাগত কেউ এলে প্রমথবাবু যখন তাঁর দরিদ্র আয়োজন নিয়ে বিব্রত হয়ে উঠতেন, তখন অন্দরে মা-মণি খানিক রহস্য খানিক আক্ষেপে চা তৈরি করতে করতে হাসতেন, দেখেছিস তোদের স্যারের কাণ্ড! 'কোথায় বাদ্য কোথায় মাল্য কোথায় আয়োজন…' আর তখন মা-মণির সংসারের সমস্ত দারিদ্রটুকুও যেন সুন্দর হয়ে উঠত।

আমরা প্রায়ই আলোচনা করতাম ম্যাট্রিক পাশ করে কে কি করব এই সব। তখন মাঝে মাঝে সমস্ত আলোচনাটাকে এক আশ্চর্য বেদনার জগতে তুলে দিয়ে মা-মণি আবৃত্তি করতেন, 'পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম, কস্তুরী মৃগ সম…'

আমরা প্রায়ই তর্ক করতাম, কে সুন্দর দেখতে, কে কুৎসিত, কে ফর্সা, কে কালো। আর তখন সমস্ত আলোচনা ভাসিয়ে দিয়ে মা-মণি হয়ত গুনগুন করে উঠতেন, 'কালো তা সে যতোই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।'

আর বিস্ময়ের শেষ পেতাম না আমরা।

খুব বেশি পড়াশুনা ছিল না মা-মণির। কিন্তু এমন আশ্চর্য একটা মন ছিল, যা আমাদের বাড়ির, আমাদের চারপাশের বাড়ির কারো মধ্যে আমরা দেখি নি। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে রবীন্দ্রনাথের যে কবিতা আমরা হয়ত কোনোদিনই পড়ে দেখতাম না, সেইসব কবিতা যেন একটা জীবন্ত মানে নিয়ে মা-মণিকে গড়ে তুলেছিল। সেইসব না-শোনা না-চেনা কবিতা থেকে আমরা কিছুতেই মা-মণিকে আলাদা করে দেখতে পারতাম না।

অথচ মা-মণির চারপাশের যে জগৎটা ছিল, তার সঙ্গে এই কবিতার জগতের এতটুকু কোনো মিল থাকলেও না হয় হত।

প্রমথবাবু পড়াতেন ভালো, কিন্তু হাজার হলেও তিনি ছিলেন মফস্বল স্কুলের এক মধ্যম মাষ্টার মাত্র। অভাব-অনটনের শেষ ছিল না। আর ওই বয়সেই মা-মণির ছেলেপিলে হয়ে গিয়েছিল একপাল। বড়ো ছেলে শ্যামলটা আমাদের চেয়ে বছর চার-পাঁচের ছোটো। আর সবচেয়ে ছোটো ছেলে কেউ ছিল না। কেন না, একটা ছেলে কোল থেকে নামতে না নামতেই দেখা যেত মা-মণি আবার একদিন তাঁদের বারান্দার এক কোণে চট টাঙিয়ে খালিগায়ে কিছু ছেঁড়া ন্যাতাকানি জড়িয়ে শুয়ে আছেন। আর অন্ধকার অশুচি আঁতুড় ঘরটার দোরগোড়ায় বসে ছানিপড়া চোখে ধাই বুড়ী কাঠকয়লার মালসায় হাওয়া দিয়ে আগুন করছে।

মাত্র এইরকম সময়ে মা-মণি কবিতা বলতেন না কোনো। কেমন অদ্ভুত তৃপ্তির এক কণ্ঠস্বরে আঁতুড়ের অন্ধকার থেকে লালচে একটা শিশুকে অল্প একটু তুলে বলতেন, 'তোদের আর একটি ভাই বাড়ল বীরু! এটা কিন্তু অন্যগুলোর মতো হবে না, নারে বীরু?'

আমরা অবাক হয়ে বলতাম, 'সত্যি মা-মণি, তোমার এ ছেলেটা ভারি স্থন্দর হবে কিন্তু।'

কিন্তু তখন যেটা তেমন করে চোখে পড়ে নি, পরে সেইটাই দৃষ্টিকটু লাগতে লাগল আমাদের কাছে। মা-মণির ছেলে হওয়া। মা-মণির কবিতার সঙ্গে এই একের পর এক ছেলে হয়ে যাওয়ার যেন কোনো মিল নেই।

আমরা শুনতাম পাড়ার সকলে ঠাট্টা করছে প্রমথবাবুকে: প্রমথবাবু আর কটি হবে আপনার?

প্রমথবাবু গম্ভীর হয়ে যেতেন।

ঠাট্টা হত মা-মণিকে নিয়েও। মুখের ওপর কেউ বলত না, কিন্তু আড়ালে মুখ টিপে বলত, গান্ধারী। মাত্র এগারোটি হয়েছে, এখনি কি। একশটি না হওয়া পর্যন্ত থামে কি না দেখো।

আমরা তখন বড়ো হয়ে উঠেছি। কলেজে পড়ছি।

এমন সব জিনিস তখন আমাদের চোখে পড়ত, যা আগে পড়ে নি।

প্রথম অনুভব করলাম, মা-মণি দেখতে মোটেই সুন্দর নয়, অথচ আগে কি সুন্দরই না মনে হত মা-মণিকে। চোখে পড়ল মা-মণির চেহারার মধ্যে কেমন একটা ধস খাওয়া ভাব আছে। কপালটা বড়ো, চুলগুলো শুধু পাতলা নয়, বিছ্‌ছিরি একটা টাক পড়েছে পাশ দিয়ে। চোখ দুটো যেন কোনো একটা রুগ্নতার চাপে খালের মধ্যে ঢোকা। চোখের কোণগুলোতে কিসের একটা কদর্য কারুণ্য। শেমিজের বাইরে কণ্ঠার হাড়টা উঁচু, ঘামাচি-ভরা শিথিল চামড়ায় ঢাকা। শরীরের সমস্ত কাঠামোর মধ্যে শুধু মাঝখানটাতেই যা কিছু স্থূলতা। তাছাড়া আর সব কিছুই কেমন শীর্ণ, শিথিল, বাঁকা, কুৎসিত। হাসলে চোখ দুটো এখনো ছলছল করে ওঠে, কিন্তু তাতে কেবল করুণাই জাগে বেশি করে।

ছুটিতে মা-মণির সঙ্গে দেখা করতে এলে এখনো মা-মণি ঠিক তেমনি করেই কবিতার সুরে সম্ভাষণ করতেন: 'গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে। দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে ?'

আমরা হাসতাম আর মনে হত, ঠিক এই লাইনটা ঠিক এমনি করেই মা-মণি আরো কতোবার যে বলেছেন। সে বলায় আর কোনো বিস্ময় ছিল না তখন, ছিল শুধু এক জীর্ণ পুনরাবৃত্তি। শুধুই এক অভ্যাস। সে অভ্যাসকে শুধুই উনিশ শতকের ভাবপ্রবণতা বললে বোধহয় ভুল বলা হবে, বলা উচিত উনিশ শতকের ভাবপ্রবণতার একটা নকল অভিনয় মাত্র।

এবং তার চেয়েও বড়ো কথা, মাঝে মাঝে সম্ভাষণ করতেও আসতেন না। প্রমথবাবু থেকে শুরু করে একপাল ছেলেমেয়ের জন্য হাজার রকমের সাংসারিক কাজ সেরে মা-মণি তখন নিজের আঁতুড়

নিজেই তৈরি করে নিচ্ছেন। বারান্দার সেই অবধারিত কোণটিতে মন্থর পরিশ্রমে চট টাঙাচ্ছেন, খড় গুঁজছেন খুঁটির চারিপাশে। বড়ো মেয়ে কমলকে হুকুম করছেন ছেঁড়া ন্যাতাকানি কোথায় কি আছে খুঁজে দেখতে।

আঁতুড়ে যাবার আগে এইরকম সময়টাতে মা-মণির হাড়-খোঁচা চেহারার মধ্যেও অবশ্য কেমন একটু মায়া জেগে উঠত। শিথিল চামড়াগুলো টান টান হয়ে উঠত একটু। বুকটা অল্প একটু পুরু। চোখের চাউনি কেমন খানিক ঢলঢল। আর তখন আমরা গেলে কবিতা শোনাতেন না মা-মণি। কেমন একটা ভরা ভরা টস্‌টসে গলায় আস্তে করে বলতেন, 'এসেছিস বীরু? বোস। তোরাতো বড়ো হয়ে গিয়েছিস এখন। বড়ো হবি, উন্নতি করবি। মাঝে মাঝে ভাবি আমার এতগুলো ছেলেমেয়ে—একটাও যদি মনের মতো হতো? একটাও হল না।'

বলতাম, 'থাক, থাক আপনি নিজে এই অবস্থায় অতো খাটবেন না। আমাকে বলুন কি করতে হবে।'

জানতাম, এর কয়েকদিন পরে এলে কি দেখব। দেখব অন্ধকারের কোণ থেকে ন্যাতাকানি জড়ানো মা-মণি একটা লালচে শিশুকে অল্প একটু তুলে বলছেন, 'তোদের আর-একটি বোন বাড়ল বীরু। এটা কিন্তু অন্যগুলোর মতো হবে না, নারে বীরু? আমার মন বলছে…'

মা-মণির মন যাই বলুক, আমি ডাক্তারি পড়ি। মেজাজটা বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছিল বিশেষ করে প্রমথবাবুর ওপর। ভেবেছিলাম, মাষ্টারমশাইকে খোলাখুলি বলব।

কিন্তু বলি-বলি করেও সঙ্কোচে আটকেছিল। তারপর কোন সময় আবার কলকাতায় ফিরে এসেছি। কলকাতার জীবনের মধ্যে ডুবে গেছি। বলা হয় নি।

বছর দেড়েক পরে আবার গিয়েছি ছুটিতে। মা-মণির সঙ্গে প্রত্যেকবারের মতো একবার আনুষ্ঠানিক দেখা করে আসতে হবে জানি। কিন্তু তখনো পর্যন্ত যাওয়া হয়ে ওঠে নি।

হঠাৎ মা-মণির বড়ো ছেলে শ্যামল নিজেই একদিন এসে হাজির হল সন্ধ্যেবেলা।

শ্যামলটা বড়ো হয়ে উঠেছে, প্রায় জোয়ান। কিন্তু সেই কবে ম্যাট্রিক পাশ করার পর আর পড়াশুনাও হয় নি ওর, কোনো কাজেও লাগতে পারে নি। ভেবেছিলাম, গতবার ও যেমন বলেছিল এবারও বলতে এসেছে, কলকাতায় কিছু একটা সুবিধা করে দিন না বীরুদা। বাবা আর টানতে পারছে না।

কিন্তু তার বদলে ও বললে, 'বীরুদা, আপনাকে এখুনি যেতে হবে আমাদের বাড়িতে। মা কেমন করছে।'

ওর ফ্যাকাশে মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন, কি হল মা-মণির ?'

শ্যামল একটু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে অস্ফুট গলায় বললে, 'ছেলে হতে গিয়ে…'

এতবড়ো এক জোয়ান ছেলের কাছে তারই মায়ের প্রসব-প্রসঙ্গ কেমন লাগছে কি জানি ভেবে তাড়াতাড়ি কথা চাপা দিলাম, 'চল্ যাচ্ছি, কি মুশকিল।'

জানতাম এই হবে। এইরকম একটা অঘটন না হওয়া পর্যন্ত ওদের এই গ্রাম্য অভ্যাসের সমাপ্তি ঘটবে না।

গিয়ে দেখি সারা ঘর থমথমে। বেকোর মতো মুখ করে প্রমথবাবু বসে আছেন চুপ করে। মা-মণির মেয়ে, শ্যামলের ছোটো বোন গীতুটারও বিয়ে হয়ে গিয়েছিল বছর দুই-তিন আগে। বাপের বাড়ি এসেছে ছেলে কোলে নিয়ে। ছেলে কোলে করেই স্তব্ধ উদ্বিগ্ন ছোটাছুটি যা করার সেই করছে। আর সেই বারান্দার কোণে ঠিক তেমনি করেই ছেঁড়া চট আর খড়-বাখারি দিয়ে অশুচি একটা

অন্ধকার কোণ রচনা করা হয়েছে ঠিক সেই আগের মতো। শুধু আগের আগের বারের মতো সেখান থেকে মা-মণির ফিসফিসে ডাক শোনা যাচ্ছে না এবার। শোনা যাচ্ছে শুধু থেকে থেকে এক বিকৃত যন্ত্রণার গোঙানি।

ঘৃণায় প্রমথবাবুর সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছে করছিল না। দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে এখুনি।

জানতাম, শহরের যে সরকারী হাসপাতালটায় নিয়ে যাবার কথা বলছি, সেখানে শহরের ভদ্রলোকেরা এখনো যেতে সাহস পায় না। তবু এই অন্ধকার নরক আর বুড়ী ধাইয়ের চেয়ে সেটা শতগুণে ভালো।

দুই দিন দুই রাত্রি ঘুম ছিল না আমার। এখনো পাশ করে বেরুই নি তবু মফস্বল হাসপাতালের সরকারী ডাক্তারদের কাছে খাতির ছিল আমার। দুদিন পরে একটি অপরিপুষ্ট মরা ছেলেকে ন্যাকড়ায় জড়িয়ে প্রমথবাবুর কাছে এনে দিলাম, 'এই নিন্ স্যার, ধরুন, সৎকার করে আসুন গে। আরো ছেলে চাই আপনার? আশ্চর্য!' আমার গলার স্বরে ঘৃণার তিক্ততাটুকু একটুও চেপে রাখার চেষ্টা করি নি আমি। প্রমথবাবুর প্রায়বৃদ্ধ নির্বোধ মুখটা খালি বিহ্বলের মতো আমার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। কিছু বললেন না তখন। বললেন রাত্রে, মা-মণি বাঁচবে এইটে জানার পর।

'বীরু, তুই ভেবেছিস এ বুঝি আমার জন্যে? নারে, আমি চাই নি! এতগুলো ছেলেমেয়ে কোন বাপে চায়? এতগুলো পেট! একটাও কি মানুষ হচ্ছে? একটাকেও মানুষ করে যেতে পারব না। কিন্তু···ওযে মানে না। ও তবু চায়!···আমি কি করব যদি···'

আমি চমকে উঠেছিলাম, 'ও মানে মা-মণি? কেন?'

প্রমথবাবু বিড়বিড় করে এলোমেলো কি সব বললেন পরিষ্কার হল না।

শুধু কী রকম একটা অদ্ভুত অস্বস্তি মনের মধ্যে বিঁধে রইল কেবল। মা-মণির যখন জ্ঞান হল, রূঢ়ভাবেই বললাম, 'এইবার খুব বেঁচে গেছো মা-মণি।' কিন্তু আর যদি ছেলে হয়, বাঁচবে না!'

মা-মণি আমার মুখের দিকে চেয়ে তারপর কি যেন খুঁজলেন। আমি জানতাম কি খুঁজছেন। বললাম, 'নেই, ওটা বাঁচে নি। কিন্তু এর পরের বার তুমিও বাঁচবে না বুঝেছো?' মা-মণি তাকিয়ে রইলেন শুধু।

কিন্তু অসহ্য একটা রূঢ়তা পেয়ে বসেছিল আমাকে। আমি বলেই চললাম, 'তুমি বুড়ী হয়ে গেছো মা-মণি, বুঝেছ? আর কেন? আর হবে না, আর হওয়া উচিত নয়।'

রূঢ়ভাবে যেটা বলেছিলাম, সেটা আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারেই বলেছিলাম। ছুটি শেষ হয়ে গেলে যাবার আগে মা-মণিকে আরও একটু নরম করে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম ব্যাপারটা। মা-মণি চুপ করে রইলেন। বললাম, 'কি ভাবছো?'

মা-মণি ম্লান হাসলেন, 'তাহলে মরে যাবো বলছিস?'

বললাম 'হ্যাঁ! তোমার দেহটা আমরা পুরোপুরি পরীক্ষা করে দেখেছি। দেহের একটা নিয়ম আছে তো। সে নিয়মকে মানতে হবে। তোমার দেহযন্ত্র আগে যা পেরেছে তা আর পারবে না।'

'দেহের সব সত্যি তোরা জেনে ফেলেছিস বলতে চাস?'

'হ্যাঁ, মা-মণি, হ্যাঁ অন্তত এটা জেনেছি।'

মা-মণি চুপ করে রইলেন একটু।

'আমার এতগুলো ছেলেমেয়ে। সব কটাকে কি ভালোই না বাসি বীরু। সব কটাকে! যেটা মরে গেলো সেটাকে দেখিনি, তবু সেটাকে ভালোবাসি কেমন। বড় থেকে ছোটটা সবাইকে। তবু কি মনে হয় জানিস, যেন ভারি সুন্দর একটা ছেলে হবে আমার। ছেলে হোক মেয়ে হোক, এমন সুন্দর একটা কিছু হবে, যা আর কারো মতো নয়।

তা কেন হয় না বীরু, বার বার এত যন্ত্রণা সইলাম, তবু সব কটাই কেমন একই রকম মামুলী হয়ে যাচ্ছে। যেগুলো হয়েছে সেগুলোকে ভালোবাসি ভীষণ, কিন্তু তবু আশা করি অন্য আর একটা···অন্য আর একটা কিছু···কিন্তু এই তাহলে শেষ, আর হবে না বলছিস ?'

আমি জোর করে প্রসঙ্গটা ফিরিয়ে এনেছিলাম চিকিৎসা-শাস্ত্রে। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ এই শেষ, আর হবে না।'

মা-মণি ছলছল চোখে অনেকদিন পরে সুর করে বলেছিলেন, 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না—'

তিনবছর পরে আবার ফিরেছি দেশে। মা-মণির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। দেখলাম মা-মণি অসুস্থ। ঘর ভর্তি একপাল ছেলে-মেয়ে। শ্যামল আমাকে দেখে দৌড়ে এল, 'বীরুদা! দেখুন আপনি যদি পারেন বোঝান। আমরা পারলাম না। লজ্জা সরম ফেলে রেখে আমি, গীতু, গীতুর ছোটোটা সবাই মিলে রোজ মাকে বোঝাচ্ছি। কিন্তু মা কিছুতেই শুনবে না। ডাক্তার বলেছে, এখনো সময় আছে···। কিন্তু মা···'

'তার মানে!' আমি চমকে উঠলাম, 'আবার ?' আমি ডাক্তার। সেবারকার অপারেশনের পর কোনো নারীর দেহ যে আবার অন্তঃসত্ত্বা হতে পারে, তা সহজে বিশ্বাস হতে চায় নি।

ত্রস্তে গিয়ে দাঁড়ালাম মা-মণির শিয়রে। মা-মণি না কোন অচেনা কুৎসিত এক প্রৌঢ়া। ফ্যাকাশে চামড়া, খোঁচা খোঁচা হাড়, শাদার ছিটে-লাগা পাতলা চুল। অন্য অন্য বার তবু একটু অস্থায়ী মায়া নামে চোখে মুখে, একটু ভরাট হয়ে ওঠে বুক। এবার তাও নয়।

শুয়ে শুয়ে মা-মণি গীতুকে দিয়ে যা যা দরকার যোগাড় করে রাখছিলেন—'ওরে গীতু, ছেঁড়া ন্যাকড়াগুলো ফেলিস্ না মা। রেখে দিস। শ্যামলটা যদি কিছু নতুন চট নিয়ে আসে···'

আমাকে দেখে মা-মণির ফ্যাকাশে মুখখানাতেও কেমন একটা অপার্থিব উচ্ছ্বাস দেখা দিল—'বীরু, তুই এসেছিস। আয়। তুই বলেছিলি হবে না, কিন্তু ছাখ....'

আমি জবাব দিলাম না। আমি জানি মা-মণি যে শয্যায় পড়ে আছেন সেটা মৃত্যুশয্যা। কোন ধন্বন্তরির হাত নেই তা রোখে।

'তুই বলেছিলি, সব সত্যি তোরা জেনে ফেলেছিস। হয়ত দেহটার কলকব্জা জানিস, কিন্তু মা-কে তোরা জানবি কি করে?'

আমি চুপ করে রইলাম। হঠাৎ চমকে উঠলাম এক অদ্ভুত স্বপ্নাতুর ফিস্‌ফিসে আওয়াজে, 'আমি মরে যাবো বলছিস?...কিন্তু এবারকার ছেলেটা হয়ত অন্যগুলোর মতো হবে না। নারে বীরু? আমার মন বলছে...'

সেই অনেক—অনেককাল আগে মা-মণি যখন দেখতে সত্যিই সুন্দর ছিল, আমরা যখন ছোটো ছিলাম তখন মা-মণি ঠিক যেমন সুরে একটা লালচে কচি বাচ্চাকে অল্প একটু তুলে ধরে আমাদের বলতেন, অবিকল সেই সুর।

জানি না কখন নিজের অজ্ঞাতে আমিও বলতে শুরু করেছি, 'সত্যি মা-মণি, এটা কিন্তু সত্যিই ভারি সুন্দর হবে... ।'

আমার দু চোখ দিয়ে কখন জল পড়তে শুরু করেছিল আমি জানি না।

জন্মভূমি

তোমায় কখনো চিঠি লিখি নি। তাই শুরুতেই একটা লজ্জায় পড়েছি, কি বলে সম্বোধন করব! দেখেছি সমবয়সী অন্য মেয়েরা কি লেখে। কিন্তু ছি, অমন কোনো বিশেষণ নাই বা রইল।

তারপর লিখবো তো, কিন্তু কোথায়? এত রাগ হচ্ছে তোমার ওপর। জানি হিন্দুস্থান অনেক বড়ো, অনেক ভিড়। যতোটা বড়াই নিয়ে গিয়েছিলে ততোটা বলার মতো কিছু করে উঠতে পারো নি হয়ত। কিংবা কে জানে হয়ত পেরেছো। শুধু ঠিকানাটা কেন দিলে না সুব্রত? তাহলে আজ যখন কাউকে একটা কিছু জানাবার জন্যে মন কি যে করে উঠছে, কিছু একটা কিছু বলার জন্যে ভারি ভারি লাগছে বুক তখন সবার আগে তোমাকেই তা জানাতে পারতাম। জানি এ চিঠি কোনোদিনই তোমার কাছে পৌঁছবে না। সেন্সর আছে, দুই রাষ্ট্রের দুই সীমান্ত আছে, তবু এলোমেলো যা ভাবি থাক্ না তা লেখা হয়ে। যদি কেউ কোনোদিন পড়ে। যদি কেউ কোনোদিন চমকে উঠে ভাবে, আরে এযে সীতার লেখা চিঠি!

ওপরের ছাপ দেখেই বুঝতে পারবে কোথায় আছি। পাকিস্তানের জেল। তুমি চমকে উঠবে জানি! কিন্তু আমিও কি কম অবাক হয়েছি নিজে? আমার মতো পাঁচিল-ঘেরা এক হিন্দুর বাড়ির কুমারী মেয়ে এমন অবাঞ্ছিত জায়গায় এসে পড়ব, তাকি আমিই ভেবেছিলাম। তবু এলাম তো। কষ্ট নেই বলব না। কিন্তু বোধ হয় সব চেয়ে উঁচু কষ্টের চাইতেও সবচেয়ে দুর্বল মানুষটা পর্যন্ত বেশী উঁচু। কিন্তু এ কথা হয়ত ভারি কথা হয়ে গেল

জেলখানায় থাকলে হয়ত এই-ই হয়। ভারি কথাগুলোকে না চাইলেও কেবলি ফিরে ফিরে আসে।

আর ফিরে ফিরে আসে কেবল স্বপ্ন, কেবল স্মৃতি। জেলে বড়ো ভাবপ্রবণ হয়ে যায় মানুষ। কেবলি কিছু বলতে ইচ্ছে করে, কিছু ভাবতে ইচ্ছে করে—এমন কিছু যাতে আমাদের এই সেন্‌ট্রাল জেলের বাইরেকার গাছগুলোর মাথার দিকে চুপ করে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে, কাঁদতে ইচ্ছে করে। শুধু ইচ্ছে, আর ইচ্ছের যে এত জ্বালা, ইচ্ছের যে এত সুখ তা কে জানত।

তুমি কেন গেলে, সুব্রত! তুমি যদি থাকতে। না জেলে নয়, জেলের বাইরে কোথাও অপেক্ষা করে। কেন গেলে। ভুল বুঝো না, এ কোনো অনুযোগ নয়। শুধু একটু ইচ্ছে। হয়ত অপেক্ষা করেই আছো অন্য একটা রাজ্যে অন্য একটা রাষ্ট্রে। দুটো মানুষ যতো সহজে হাতে হাত দিয়ে ঘন হয়ে আসতে পারে দুটো রাষ্ট্রও কি তা পারত!

তুমি যখন যাও তখন নানা কথার মধ্যে কি বলেছিলে মনে আছে? হয়ত তোমার দিক থেকে তুমি শুধু বলার ঝোঁকেই বলেছিলে, ভেবে বলো নি। তারপর হয়ত হিন্দুস্থানের নানা ভিড়ে আরো নানা কথার মতো সে কথা তোমার মনে নেই। কিন্তু আমি যে মনের মধ্যে সঞ্চয় করে রাখার মতো কথা অল্প শুনেছি সুব্রত। তোমার প্রতিটি কথা আমি গুণে গুণে মনে করতে পারি। যাবার আগে তুমি বলেছিলে, 'না, আর পারলাম না সীতা। ভেবেছিলাম জন্মভূমি ছেড়ে যাবো না। কিন্তু কই, কোথায় আমার জন্মভূমি। সংখ্যালঘুরা তাদের জন্মভূমি হারিয়েছে সীতা। দেখি অন্তত স্বদেশটুকু খুঁজে পাই কিনা।'

তুমি হিন্দুস্থানে চলে গেলে।

আর ঝনাৎ করে কথাটা আমার মনের কোন একটা জায়গায় গিয়ে ঘা মেরেছিল। জন্মভূমি! কী আশ্চর্য ধ্বনি কথাটার!

কিন্তু কী সেটা, কী ! তোমরা জন্মভূমি পেয়েছিল, পেয়ে হারিয়েছ ? কিন্তু আমি ? আমার বয়সী মেয়েরা যে তা কোনোদিন পেলই না। আজ আমি কুড়ি। তুমি যখন চলে গেলে, তখন আমি ষোল। আর জন্মভূমি বলতে যে বয়সে কিছু একটা মনে মনে গড়ে তোলা যায়, কিছু একটা দিয়ে বুক ভরে নেওয়া সম্ভব, আমার সে বয়সে পৌঁছবার আগেই তো দুদিকের সংখ্যাগুরুরা আপন আপন দেশ ভাগ করে নিলে। শুনতাম, একটু একটু বুঝতে শুরু করা থেকে শুনতাম, বড়োরা কখনো উত্তেজিত হচ্ছে, কখনো উল্লসিত। কখনো ইংরেজের কথা হচ্ছে, কখনো লীগের, কখনো কংগ্রেসের। কখনো দাঙ্গার, কখনো স্বাধীনতার। আর যে কথাই হোক, তাতে বিস্ময়ের চেয়ে অনিশ্চয়ের ভাবটাই থাকত বেশী, তৃপ্তির চেয়ে অস্থিরতার। বড়োদের এই অনিশ্চিত ভাবনার জগৎটায় মাঝে মাঝে উঁকি দিয়েছি। কিন্তু সে নেহাতই মাঝে মাঝে। নেহাতই না-বোঝা কৌতূহলে।

তারপর অনায়াসে আমাদের বাড়ির মস্ত আঙিনাটায় পাড়ার আরো চার-পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে জুটে গোল হয়ে চেঁচিয়েছি : এলাটিং বেলাটিং সই লো ! রাজার খবর আইলো ! কি খবর আইলো ! একটি বালিকা চাইলো ! কোন্ বালিকা চাইলো ! যুথী বালিকা চাইলো !...তারপর যুথীকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে ঝপাৎ করে কোপ মেরেছি হাতে হাতে ধরা হাতের ওপর।

না হেসো না। কিন্তু সত্যিই তো তখন কী ভীষণ ছেলেমানুষ আমরা। তারপর সত্যিকারের রাজার খবর একদিন এল। বড়োরা বললে, আমরা পাকিস্তানে পড়েছি। কিছু একটা হল নিশ্চয়ই। কিন্তু বাইরের কিছু ধারণা হবার বয়স থেকেই অনিশ্চয়ের যে পালা শুরু হতে দেখেছিলাম সেইটেই একান্ত হয়ে উঠতে লাগল আমাদের কাছে। প্রতিদিন শুধু একটি আলোচনা শুনতে শুনতেই আমাদের কালের ছেলেমেয়েরা বড়ো হয়ে উঠতে লাগল—চলো যাই, পালাই, আর নয়।

গান শুনেছি, 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা।' কিন্তু বিশ্বাস করো, কোনো কবি এমন বুকভরা সার্থকতা নিয়ে কি করে একথা রচনা করতে পারে ভেবে অবাক হতাম! জন্মভূমির কাছ থেকে কি পেয়েছিল সে কবি যাতে এত সুর ঢেলেছিল, এত দরদ? আমরা তা পাইনি। জন্মভূমি আমাদের কাছে আবেগের উৎসভূমি হতে পারল না কোনোদিন।

তাতে জানোতো, আমরা মেয়ে। বেশ একটু বনেদী হিন্দু সংসার আমাদের। আমাদের বাড়ির চারপাশে বেশ উঁচু করে দেয়াল তোলা। পুরনো বাড়ি। তাই এ পাঁচিলের সারা গায়ে শ্যাওলা জমে থাকে সারা বছর। গরমের সময় তা শুকিয়ে শুকিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো বাদামী রঙ ধরে, তারপর আবার সারা বছর ধরে সেই নোংরা সবুজ। এই দেয়ালের বাইরেকার জগৎটাকে বোঝার মতো বয়স যখনই আসে তখনই এ বাড়ির মেয়েদের এসে ঢুকতে হয় এই দেয়ালের ভেতর। আর যে অনিশ্চিত যুগটায় আমরা বেড়ে উঠলাম, সেখানে যে কি হবে তা ভেবে দেখো। বাইরে একটু উঁকি দিতে গেলেই যতো রাজ্যের নিষেধ আসত পেছন পেছন ফিসফিসিয়ে, 'যাসনে! এই সীতা যাসনে।'

শুধু বড়োরা নয়, শুধু মা-কাকীরা নয়, স্কুলে (স্কুলটা যদি আমাদের বাড়ির কাছে না হত, তা হলে, স্কুলেও পড়া হত কিনা কে জানে) সমবয়সী মেয়েরা পর্যন্ত গণ্ডীর বাইরে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়াত শঙ্কায়, 'না ভাই, আর বেশি যাবো না! এই সীতা, তোর বড়ো সাহস দেখছি....'

জন্মভূমি আমরা দেখলামই না কোনোদিন।

আর ওই ঘেরা দেয়ালের ভেতরকার অবস্থা তুমিও তো কিছু দেখেছো। তবু সবটা তুমিও জানো না। সবটা তোমাকেও বলা যায় নি। সকাল সন্ধ্যে ঘুরতে ফিরতে একটি কথাই শুধু সেখানে বার বার চীৎকার করে উঠত: চলো যাই, পালাই! আর থাকা

চলে না। যেন আমরা বাড়িতে নেই, আছি কোন প্ল্যাটফর্মে বসে। শুধু কোথায় যাবো জানি না বলে ঘণ্টার সময় হলে উঠে দাঁড়াই, তারপর ট্রেন চলে গেলে বসে বসে আলোচনা করি, কেন ট্রেনটা ছেড়ে দেওয়া হল।

অথচ, সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের এ শহরটায় আসলে কখনো দাঙ্গা হয় নি। অন্য দু-একটা জায়গার কথা শুনেছি, তেমন আতঙ্কের ঘটনা ঘটতে দেখি নি একটিও। কটা শহরেই বা তা হয়েছে। কিন্তু অনিশ্চয়ের যে পালা সেই কবে থেকে শুরু হয়েছিল, তা তো থামল না আর। আমাদের সংসারে তার যে রূপটা মর্মান্তিক হয়ে উঠেছিল, তাকেই বোধহয় ভাঙন বলে।

দাদুকে দেখেছো তো। আশী বছরের বুড়ো। কিন্তু আমরাও দেখেছি, বুক টান করে হেঁটে যেতেন কাছারিতে। আজীবন কাউকে পরোয়া না করে নাকি উনি ধমক দিয়ে এসেছেন ছেলেদের, নাতিদের, আইন-না-জানা হাকিমদের পর্যন্ত। উনি দাঁড়ালে মক্কেলরা যেন স্বর্গ পেত। কয়েক বছরের মধ্যে সেই দাদু কি রকম থুরথুরে বুড়ো হয়ে গেল যদি দেখতে। সকাল থেকে এখনো তেমনি বকাবকি করে যান বাড়ির ভেতরে, কাছারি ঘরে, বার লাইব্রেরিতে—কিন্তু শোনার কেউ নেই। মক্কেল হয় না আর। উনিই বুড়ো হয়ে গেছেন, নাকি অল্প পয়সায় নতুন মুসলমান উকিল পাওয়া যাচ্ছে, নাকি তাঁর প্রধান প্রধান যেসব হিন্দু মক্কেল ছিল তারা দেশ ছেড়ে চলে গেছে, নাকি সাধারণভাবেই চাষীদের হাতে আর পয়সা নেই, কে জানে কি! শুধু শূন্য পকেটে, আপনমনে বকতে বকতে মানুষটা যখন বাড়ি ফিরত তখন তার মুখের দিকে আমরা চাইতে পারতাম না।

নেহাত এক আত্মসম্মানের জেদে যে মানুষটা কিছুতেই কাঁদতে পারছে না তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছো কখনো? তাহলে দাদুর চেহারাটা বুঝতে পারতে।

আর বাবা কাকাদের কথা না বলাই ভালো। অধিকাংশ নিশ্চিত সংসারের বহু ছেলের যে দশা হয়, তাঁদেরও হয়েছিল তাই। দাদুর যতোদিন পশার ছিল, ততোদিন ভাবনা ছিল না। কিছু একটা করছি এই ভেবে তাঁরা আজ এ ব্যবসা, কাল ও ব্যবসা, আজ এ কাজ, কাল ওকাজ করে কাটিয়ে এসেছেন, কিন্তু কখনো সাবালক হন নি। মুশকিলে পড়লে দাদু ছিল। আজ এতদিন বাদে মধ্যবয়সী ছেলেগুলো এখন দুচোখে অন্ধকার দেখছে। যেটুকু সঞ্চয় ছিল, তাও সেই অনভিজ্ঞ নাবালকের মতো দুদিনে নিঃশেষ করে দিতে তাঁদের দেরি হয় নি। পাটের আড়ৎ, গেঞ্জির কল, বাসের লাইসেন্স—সব কিছুই হতে হতে ভেস্তে যাবার পর নিজের নিজের সংসারের ভার নিয়ে তাঁরা সবাই ওই পাঁচিল-ঘেরা জায়গাটুকুর ভেতরে গুটিয়ে এসেছেন।

অমুকের খাওয়া জুটছে না—এ কথাটা আগে কতো শুনেছি। কিন্তু সত্যি সত্যি উপোস দিচ্ছে একটা মধ্যবিত্ত সংসার দেখেছো কখনো ?

রোজ সকালে উঠে ফ্যানভাত খাওয়া আমাদের অভ্যেস। এই বাঙালে খাওয়াটা হয়ত তুমি কলকাতায় গিয়ে ভুলেই গেছ। কিন্তু কলকাতায় না গিয়েও আমাদের ভুলতে হয়েছে। সারি সারি কলাপাত পড়ত রান্নাঘরের দাওয়ায়। ছেলেপিলে আমরা তো বটেই, বড়োরা পর্যন্ত হুড়হুড় করে গিয়ে বসত পাতা টেনে ? সোঁদা গন্ধের লাল লাল ধোঁয়ানো ভাতের উপর কাকিমা থপ-থপ করে ছিটিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন আধগলা গাওয়া ঘি। অন্য উপকরণ যা কিছু তা সব সেদ্ধ—ডাল সেদ্ধ, আলু সেদ্ধ, বেগুন সেদ্ধ, কুমড়ো সেদ্ধ—এইটে ছিল আমাদের সবচেয়ে প্রিয়। কী ভীষণ যে চেঁচাতাম, গলা আমাকে গলা! কাকীমা, আমাকে দিলেন না ?

কিন্তু সে-পাট অনেকদিন ঘুচে গেছে।

তুমিও দেখেছিলে, কিন্তু হয়ত এতটা, ছাখো নি। এখন যদি কখনো যাও, দেখবে সকাল হলেও আমাদের বাড়িতে সকাল হতে চাইছে না। দাদু খড়ম পরে আপন মনে তাঁর পৈতের সঙ্গে বাঁধা চাবির গোছাটা হাতের মধ্যে অপ্রস্তুতের মতো নাড়াচাড়া করতে করতে চুপ করে গিয়ে বসে আছেন কাছারিতে। ঠাকুমা ভোর থেকে লক্ষ্মীর ঘরে বসে খুটখুট করেই চলেছেন। তারপর কাজ না পেয়ে জড়ো-করা নারকেলের পাতা থেকে ঝাঁটার কাঠি বার করতে বসেছেন। তা দিয়ে কার দালান কোঠা ঝাঁট দেওয়া হবে কে জানে। বাবা কাকারা ভূতের মতো চুপ করে বসে আছেন যে যার নিজের নিজের ঘরের মধ্যে। এখনো এক গাদা ছেলেমেয়ে আমাদের সংসারে। কেউ আশ্রিত কেউ অযাচিত। বার দু-চার এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে তারা কেউ ছেঁড়া ছেঁড়া বইখাতা টেনে বসেছে, কেউ আপন মনে ঘুরছে রাস্তায়। শুধু সবার ছোটো পিণ্টু একটা খালি বাটি হাতে করে কখনো মা কখনো কাকীমার পায়ে পায়ে ঘুরে ঘুরে তারপর অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বুড়োদের মতো ঝগড়া করতে শুরু করেছে, 'খাবার দিবার পারে না ক্যান? গরীব হয়া গিছে সব। সব খায়া স্যাস করছে, হেঁ! গরীব হয়া গিছে সব!'

ঠাকুমা নিজের মনেই সব সময় থাকেন। হঠাৎ কি ভেবে নারকেলের পাতাগুলো গোছা ধরে সরিয়ে রেখে ডাকাডাকি করবেন, 'বৌমা, অ বৌমা—আঃ কি যে তোমাগেরে কাম এত…' তারপর নিজেই ভুমদুম করে পা ফেলতে ফেলতে গিয়ে উঠবেন রান্নাঘরের দাওয়ায়। বাজারের ঝুড়িটা উঠোনের ওপর নামিয়ে দিয়ে বলবেন, 'কউ? কেডা যাবিরে, ধরেক। মাছেরডা তো আমি ছোব না নে। ক'নে টাঙায়ে থুছে বুঝিবা। বৌমাক শুধা। কউ?'

আর তবুও যখন উত্তর পাবেন না কারো কাছ থেকে, তখন হঠাৎ ক্ষেপে উঠবেন—'ওয়াহ্। অলক্ষ্মী ধরছে তোমাগো।

ওয়াহ্।' তাঁর ওই ভাঙা ভাঙা আক্ষেপটা কান্নার না অভিশাপের তা তুমি বুঝতে পারবে না।

সারা সকাল আমরা পড়ার ঘর থেকে, এ কোণ থেকে ও কোণ থেকে নজর রেখে অপেক্ষা করতাম নিঃশব্দে। বাজার না হলে উপোস দেয়া, ছোটোদের পর্যন্ত অভ্যেস হয়ে গিয়েছে এ বাড়িতে। আর যেদিন বাজার হত—সেদিন বার-বাড়ি থেকে দাদু হঠাৎ বকতে বকতে ফিরে এসে একটা দুটো টাকা বার করে দিয়ে বলতেন, 'ন্যাও, দিবার চায় না। ছ্যাচড়ামি করা চাবারও পারিনি কোনোদিন। এখনো তোমাগেরে লেগে তাও করা ধরছি। ন্যাও! আজো সব আমারই করা লাগবে, করি। যতদিন আছি……'

সেদিনকার অবস্থা যদি দেখতে। এ সংসারের কোণে কোণে যতো অভাব অপেক্ষা করে থেকেছে, তারা সবাই সতৃষ্ণের মতো তাকাতে শুরু করে ওই দেড়টি কি দুটি টাকার দিকে।

কাকীমা এসে প্রথমেই জানিয়ে দেবেন, 'শুধু চাল কিনে শেষ করিস নারে। কাঠও নেই। শঙ্কর, দেখিস তো রাস্তা দিয়ে কাঠ যায় কিনা।'

ছবু ঘোরাঘুরি করে এক সময় বলে যাবে, 'দু পয়সার সাবু এনো কিন্তু পিণ্টুর জন্যে। ওতো ভাত খাবে না….'

মনি ভয়ে ভয়ে বলবে, 'একটু কাগজ হবে না ওথেকে। নইলে স্কুলে সে যাবে না, কিছুতেই যাবে না। কেন যাবে? বই নেই, খাতা পর্যন্ত নেই, কেন যাবে?'

আর বাজারে বেরিয়ে যাবার সময় সদর দরজায় একটু দাঁড় করিয়ে ফিসফিসিয়ে মা বলবেন, 'দেখিস তো বাবা একটু সূচ পাওয়া যায় কিনা? হবে তো পয়সায়? ছোটো ছোটো দুটো সূচ আর একটু সুতো। কাপড়গুলো যদি…'

আর তারপর, সন্ধ্যে বেলায়, অনিবার্যভাবেই ফিরে আসবে সেই প্রশ্ন : চলো যাই। আর নয়।

—ভুঁয়া পাড়ার জানকী ভুঁয়ারা নাকি বাড়ি ফ্যালায়ে থুয়েই চলল।

—মা জানো, লীলা দিদিমণিরাও চলে গেল। ওদের নাকি যাদবপুরে থাকার জায়গা হবে।

—সগ্‌গলেই যাতেছে, সগ্‌গলকেই যাওয়া লাগবে। আর কয়দিন....

কেরোসিন তেলের ঝাপসা আলোর রেশটুকু আমাদের সেই ছাতলাপড়া পাঁচিল পর্যন্তও যেত না। আর পাঁচিলের ওপাশে ... ভূমিটা জন্মভূমি তার মতো অনিশ্চিত আর কি থাকতে পারে আমরা ভেবে পেতাম না। আমরা জানতাম ও বাইরেটা আমাদের নয়, পাকিস্তানের সংখ্যাগুরুদের।

এর মধ্যেই কখন বড়ো হয়ে উঠলাম আমি।

কিন্তু বড়ো হয়ে উঠলাম ভয়ের মধ্যে। বাইরেটা ভয়ের, কালটা ভয়ের, আর আমার বড়ো হয়ে ওঠাটাও যে ভয়ের তা মা কাকীর দিকে তাকিয়ে বুঝতে দেরি হয় নি আমার। মাঝে মাঝে এত কান্না পেত—কেন বড়ো হলাম আমি।

এই সময় তুমি এসেছিলে। তুমি পড়া না দেখিয়ে দিলে হয়ত ম্যাট্রিক পাশ করা আমার হত না। কিন্তু সে জন্যে নয়। এই ভয়ের রাজ্যে তার চেয়েও বড়ো কিছু একটা তুমি আমায় দেখিয়েছিলে। মনে আছে সেই বেড়াতে যাওয়া? সেই স্টেশনের রাস্তাটা দিয়ে অনেকদূর, সেই ব্রিজের কাছটা পর্যন্ত। এই শহর তো আমাদেরই শহর, তবু স্কুল সিনেমা হল আর এ-পাড়া ও-পাড়ার দু একটা চেনা বাড়ি ছাড়া তার কতটুকুই বা এতদিন দেখেছিলাম।

আর সেই পাট ক্ষেতটার কথা মনে আছে? ভেবে ছাখো, বাড়িতে রোজই পাটশলা দিয়ে উমুন জ্বালানো হয় আমাদের, অথচ তাজা পাটক্ষেতের কাছে তার আগে কখনো যাই নি আমি। অতো

বড়ো বড়ো অমন তক্তকে গাছগুলো দেখে কি খুশী হয়েই না ঢুকে পড়েছিলাম ভেতরে! মনে হয়েছিল, আহা ছবু, গীতু এরা সব থাকলে কি সুন্দরই না লুকোচুরি খেলা যেত এখানে? তোমাকেও বলেছিলাম, খেলবে? কী সুন্দর যে লাগছে···

তুমি একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলে, ছি, নৌকোতেও ওঠো নি কখনো?

'না তো!'

৮ 'তুমি হাসালে সীতা। এই পদ্মার দেশের মেয়ে হয়ে এতদিন পদ্মাটাও দেখো নি তুমি, নৌকোতেও চাপো নি। ছি ছি।'

তুমি যতো হেসেছ, ততো আমি রেগেছি, 'না দেখিনি, দেখিনিই তো। কে দেখাবে? একটু বেরুলেই কি করে ত্থাখো না! ভয়, ভয়, চারিদিকে কেবলি ভয় দেখছে ওরা··· ।'

তুমি নিয়ে গিয়েছিলে একদিন। কতদূর হেঁটেছিলাম মনে নেই। পুরনো শাড়িটা ফ্যাচ করে ছিঁড়ে গিয়েছিল পাড়ের কাছে। অন্য সময় হলে কি করতাম জানি না। সেদিন কিন্তু তাতে খুশীর ঝোঁকটাই বেড়ে গিয়েছিল আমার। হি হি করে বেহায়ার মতো হেসে উঠে ছেঁড়া পাড়ের টুকরোটুকু পুরোপুরি ছিঁড়ে ফেলে হালকা করে নিয়েছিলাম পা দুটোকে। পদ্মার এ-দিকটায় তখন চর পড়েছে। শীতকাল ছিল, নয়? মিহি মিহি বালির মধ্যে কাঁটা কাঁটা কাশ আর শরের ঝোপ মাথা তুলেছে। মাঝখানটায় বালি থিতিয়ে মাটি জেগেছে। তাতে কি সুন্দর মুগ কলাইয়ের ক্ষেতগুলো। হঠাৎ আমি ছুটতে শুরু করেছিলাম—ওই তো পদ্মা! না? হ্যাঁ ওইতো! আস্তে আস্তে ফাঁকা হয়ে যাওয়া চরের একটা বাঁকে হঠাৎ দেখা গিয়েছিল সেই ঝকঝকে সাদা রূপোর একটা স্তম্ভিত বিস্তার এক রাশ আনন্দের মতো দিগন্ত থেকে দিগন্তে বেঁকে গেছে।

'নৌকা! নৌকা!' ফুলের পাপড়ির মতো ভেসে যাওয়া পাল-তোলা দুটো নৌকো দেখে আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম ছেলে মানুষের

মতো। তুমি থামিয়েছিলে, 'আস্তে! সীতা এখনো মাইল দেড়েক।'

আমাদের বাড়ির সদর দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতোদিন দেখেছি—মাথায় করে লোকে সবজি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। খেজুরের পাতা ভরা দুধভর্তি হাঁড়ি নিয়ে হেঁকে যাচ্ছে, 'দুধ! দুধ!' নিকিরিরা হন্‌হন্‌ করে হাঁটতে হাঁটতেই দরাদরি করছে আর ব্যস্তসমস্ত হয়ে এগিয়ে চলেছে বাজারের দিকে। শুনতাম, চর থেকে আসছে ওরা, পদ্মা থেকে আসছে। তার বেশি কখনো জানি নি। সেদিন, গমের ক্ষেতে উঁচু হয়ে বসে বসে যারা নিড়ানি দিচ্ছিল তাদের দিকে দেখিয়ে তুমি বলেছিলে, 'ছাখো তো সীতা চিনতে পারো কিনা—'কিন্তু তারপরেই তুমি গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলে! চরে যারা কাজ করছিল, খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা, উরুর ওপর গুটিয়ে তোলা লুঙ্গি পরা, চওড়া পিঠের জায়গায় জায়গায় কাদা লাগা সেইসব লোকগুলো আমাদের দেখে অবাক হয়ে নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করছিল কে জানে। দেখলাম তুমিও থমকে গেলে, বললে, 'থাক ফিরে চলো।' আমিও ভয়ে ভয়ে বলেছিলাম, 'চলো।'

তুমিও ভয় পেলে সুব্রত? কেন ভয় পেলে? সেদিন ফিরে এসেছিলাম। আর আজো পর্যন্ত পদ্মা দেখা আমার হয়ে উঠল না।

যে সেণ্ট্রাল জেলটায় আমি এখন আছি, শুনেছি তার দোতলা থেকে নৌকো দেখা যায়, ইষ্টিমার দেখা যায়। জ্যোৎস্না উঠলে গরাদের ভেতর থেকেও চোখে পড়ে জরির ওড়না খসিয়ে আকাশ মাটির শয্যায় বিস্রস্ত বসনে গা এলিয়ে দিচ্ছে। সে রূপসীর নাম পদ্মা। কিন্তু দোতলায় ওঠা আমাদের হুকুম নেই। মেয়েদের ওয়ার্ড থেকে শুধু গাছের মাথাগুলো দেখি। বাকিটুকু কল্পনা করে নিতে হয়।

দেয়াল দেওয়া সেই ঘরটুকুতেই আবার ফিরতে হয়েছিল আমাকে। আর তুমি চলে গিয়েছিলে ঢাকায়—বোধ হয় কি একটা চাকরির আশা পেয়ে।

ফিরে এলে সেই পঞ্চাশ সালের হাঙ্গামাটার পর। কি দেখেছিলে, কি হয়েছিল জানিনে। তোমায় দেখে মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল আমার। উদ্‌ভ্রান্ত চোখ তুলে তুমি বলেছিলে, 'সীতা, চলো পালাই এখান থেকে, এ রাজ্য ছেড়ে। যাবে?'

বুক দুরদুর করে উঠেছিল স্বপ্নে। বলেছিলাম, 'চলো।'

কিন্তু তোমার ঐ উদ্‌ভ্রান্ত চোখ দুটো কেন অস্থির হয়ে উঠেছিল তুমি নিজেও কি জানতে? একটু থেমে কান্নার মতো গলায় বলেছিলে, 'কিন্তু এযে এক ছন্নছাড়া গ্রাম! জন্মভূমি নইলে কোথায় দাঁড়িয়ে আমরা ভালোবাসব, সীতা!'

আমি তোমার কথা বুঝি নি। তুমি নিঃশব্দে ফিরে গিয়েছিলে সেদিন। তারপর হিন্দুস্থানে যাবার আগে বলেছিলে সেই কথা: জন্মভূমি তুমি হারিয়েছ। দেখবে স্বদেশ খুঁজে পাও কিনা।

কান্না চেপে আমি বলেছিলাম, 'তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকব?'

'থেকো।'

তুমি হিন্দুস্থানে চলে গেলে।

কিন্তু কথাটা আমার মনের কোথায় ঝনাৎ করে উঠেছিল। জন্মভূমি! মীরাদিও মাঝে মাঝে এইরকমের কথা বলতেন। আমাদের স্কুলের মীরা দিদিমণি, তুমি কি চিনতে? রোগা, ছিপছিপে একটু ময়লা রঙ? এত ভালো লাগত তাঁর পড়ানো। আর পড়ানোর চাইতেও তাঁর অদ্ভুত সব কথা। হালকা মুখখানায় তাঁর জ্বলজ্বল করত চোখ দুটো, বলতে বলতে কেমন একটা স্বপ্নের ঘোর লাগত তাঁর কথার সুরে, কিছু একটা বলতে বলতে হঠাৎ কি এক আশঙ্কায় অনেক কিছুই না-বলা রেখে কপালের ওপরকার এলোমেলো চুলগুলোকে তীর্যক ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে চলে যেতেন। তিনিই কখনো কখনো একলা পেয়ে আমাদের বলেছেন, জন্মভূমি কি অমনি পাওয়া যায় সীতা, তাকে জয় করতে হয়।

কী করে জয় করার কথা ভেবেছিলেন মীরাদি জানি না। আমি ম্যাট্রিক দেবার কিছুদিন আগে থেকেই দেখা গেল মীরাদি আর স্কুলে আসছেন না। ভাসাভাসা কিছু গুজব শুনেছিলাম বটে কিন্তু কান দিই নি। অনেকদিন পর হঠাৎ চমকে উঠলাম খবর শুনে। মীরাদিকে নাকি কোন একটা গ্রাম থেকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিসে। জমিদার ভাগচাষী নিয়ে কি একটা হাঙ্গামার পর গ্রামের মুসলমানরাই ধরিয়ে দিয়েছে। ভাবতে গিয়ে আমার চোখের সামনে কেবল ভেসে ভেসে উঠেছিল সেই মূর্তিগুলো, পদ্মার চরে যারা ক্ষেতে নিড়ানি দিচ্ছিল। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, হাঁটুর ওপর উঁচু করে আটা লুঙ্গি, চওড়া পিঠের জায়গায় জায়গায় কাদা, জায়গায় জায়গায় দাদ, ঘা, চুলকানি। ভয়ের এই একটা মূর্তিই আমার চেনা।

আদালতে ষ্ট্রেচারে করে নিয়ে আসা হয়েছিল মীরাদিকে। সেখানে তিনি অত্যাচারের যে কাহিনী বলেছিলেন, তা হয়ত তুমিও কাগজে দেখেছো। আর আমরা? না আমরা কেউ আদালতে তাঁকে দেখতে যাই নি। বড়োরা কেউ কেউ গিয়েছিল। আর আমরা অন্যের মুখ থেকে সেই কথা টুকরো টুকরো করে শুনে আমাদের সেই শ্যাওলাধরা দেয়ালটার ভেতরে চমকে চমকে উঠেছি। শুনতাম, সওয়ালের মধ্যে মীরাদি নাকি বলেছেন, 'ওরা আজ আমায় ধরিয়ে দিয়েছে। একদিন ওরাই আবার ছিনিয়ে আনবে আমাকে।'

কথাটা সেদিন কেই বা মনে করে রেখেছিল।

আমার ম্যাট্রিকের ফল যখন বেরুল তখন তুমি ছিলে না। তুমি চেয়েছিলে আমি যেন কলেজে পড়ি। কিন্তু কলেজে পড়াও আমার হয় নি। কেন হয় নি জানো। যে বাড়ির ছোটো ছেলেটাকে মাসের মধ্যে তিন-চারদিন খালি বাটি হাতে করে মা কাকীর পায়ে পায়ে ঘুরে ঘুরে তারপর ঘাড় গোঁজ করে অভিমানে ঝগড়া করতে হয়, 'খাবার দিবার পারে না! গরীব হয়া গিছে সব। গরীব হয়া গিছে।

হে!' সে বাড়ির মেয়ে তার ছেঁড়া কাপড় সামলে কলেজে যাবে এ কখনো হতে পারে! কলেজে যাওয়া আমার এমনিতেই হত না, তবু নতুন একটা কারণও জুটল।

আমাদের বাড়ির উত্তর দিকে চৌধুরীদের যে দোতলা দালানটা রিকুইজিশন করে নেওয়া হয়েছিল, সেখানে কি এক নতুন হাকিমের কোয়াটার হয়েছে। সেই বাড়িরই একটা ছেলে, সিরাজুল। আমাদের বাড়ির সদর দরজা ফাঁক করে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকতে ছেলেটাকে অনেকদিন দেখেছি, কলেজে যাচ্ছে নয়ত মোড়ের ল্যাম্প পোস্টটার কাছে দাঁড়িয়ে আড্ডা মারছে ওরই সমবয়সী আরো কয়েকজনের সঙ্গে।

দু'একটা কথাও না হয়েছে এমন নয়। আমি হয়ত দরজায় দাঁড়িয়ে পিণ্টুকে পাঠিয়েছি রাস্তা থেকে কাঠ গেলে নয় দুধ গেলে ডেকে আনতে। পিণ্টু দর করতে পারে নি। ও অনেক সময় দর করে দিয়েছে। তারপর ভয়ে ভয়ে বে-দরকারী কথাও বলেছে দু'একটা— কোন ডিভিশনে পাশ করেছি। কলেজে পড়ব কিনা। কলেজে ফ্রি করে দেওয়ার জন্য ও কি সাহায্য করতে পারে, এইসব।

এত লাজুক তুমি যদি দেখতে। আর এমন কবির মতো ওর চোখ দুটো। হেসো না, কিন্তু আমার কি মনে হয় জানো। বাঙলা দেশে কবিতা যদি কেউ লেখে, তবে বোধহয় তা এবার ওরাই লিখবে। সেই ছেলেটা একদিন কি ভেবেছিল কে জানে, আনাড়ীর মতো কোনোরকমে আমার হাতে একটা চিঠি গুঁজে দিয়ে লজ্জায় মুখ লাল করে তাড়াতাড়ি আবার চলে গিয়েছিল তার নিত্যকার কলেজের পথে। তারপর দুদিন লজ্জায় আমার সামনে আসেনি।

একদিন আমি নিজেই ওকে ডেকেছিলাম। জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমার মধ্যে কি ও দেখল যাতে এমন কবিতা লিখেছে?

ও কি বলেছিল জানো? বললে, আমি হিন্দু মেয়ে। আমার

মধ্যে নাকি স্বাধীনতার এমন একটা ছন্দ আছে, রুচির এমন একটা আভা আছে যা ওদের সমাজে ও দেখেনি।

হায়রে, আমাদের শ্যাওলা-ধরা দেয়ালটার কথাও কি ও কিছু জানে না?

আমি চুপ করে শুনলাম। তারপর জানিয়েছিলাম তোমার কথা। শুনে ওর কবির মতো মুখটা এমন কালো হয়ে গেল যে কী বলব। ওর জন্যে এত কষ্ট হয়েছিল যে সেদিন রাত্রে আমি না কেঁদে পারি নি। তারপর থেকে ও পারতপক্ষে আমার চোখে পড়তে চাইত না। অপরাধীর মতো পালিয়ে পালিয়ে বেড়াত।

ইতিমধ্যে কেমন করে যেন সে চিঠিটা আমার ছেঁড়া বই খাতার মধ্যে থেকে পথ করে গিয়ে পড়েছিল মা, কাকীমা, তারপর বড়োদের হাতে। তিন-চারদিন ফিসফিস করে গুঞ্জন চলল, না আর পারা যাবে না। হিন্দু মেয়েদের সম্মান নাকি বজায় রাখা মুশকিল। এ কেলেঙ্কারির কথা কেউ যেন না জানে। তাহলে নাকি আমাকে পার করা যাবে না। এই সব। তারপর আবার যথা-নিয়মে সব থিতিয়ে গেল। শুধু ফ্রি পাওয়া সত্ত্বেও কলেজে পড়া আমার হল না।

হয়ত ওই শ্যাওলা-ধরা দেয়ালটার মধ্যেই আমার অপাপবিদ্ধ কৌমার্যের বালাই নিয়ে আজো আমায় ভুগতে হত। শোভাদি আমায় বাঁচালেন। বললেন, 'সীতা, তুই তো ভালোই ম্যাট্রিক পাশ করেছিস। এদিকে আমাদের স্কুলটা তো বন্ধ হবার যোগাড়। হিন্দু টিচাররা এক এক করে সকলেই প্রায় চলে গেল। মুসলমান টিচারই বা কোথায় এত পাওয়া যাবে? তুই আয় না। নিচু ক্লাসগুলো তো অন্তত পড়াতে পারবি।'

ভাগ্যিস কাজটা নিয়েছিলাম। বাড়িতে তাই অন্তত কয়েকটা করে টাকা তো সাহায্য করতে পেরেছি। প্রথমটা অবিশ্যি ভারি অস্বস্তি লেগেছিল। যে স্কুল থেকে এই সেদিন পাশ করে বেরিয়েছি, সেখানেই দিদিমণি হয়ে চেয়ারে বসা। কেউ মানতেই চায় না।

কিন্তু তারপরে আমারও কেমন নেশা লেগে গেল। আর আমার ছাত্রীদের যদি দেখতে। ক্লাস থ্রি, ফোর আমার এলাকা। আর ভেবে ছাখো, আমার কাছে পড়া শুনছে আনোয়ারা—শহরেরই এক দুধওয়ালার মেয়ে ফতিমা—ওর বাপ নাকি সাইকেল রিক্সা চালায়, শান্তি—নাম শুনে ভেবো না হিন্দু; জজের কাছারির এক কেরানীর মেয়ে, সালেহা—এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বউ, তিন ছেলের মা হবার পর এতদিনে ঠিক করেছে লেখাপড়া না শিখলে চলবে না, এমনি কতো বলবো। দুধওয়ালার মেয়ে. ঘুঁটেওয়ালীর মেয়ে থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পিছিয়ে-পড়া বৌ পর্যন্ত সকলে এমনি আগ্রহ করে এমন শিশুর মতো বিস্ময়ে আমার ভুল-ভাল জানা না-জানা প্রত্যেকটি কথা গিলত যে আমার বুক তুরতুর করে উঠত উন্মাদনায়। এমন হয়, আমি কখনো জানতাম না। কিছু একটা গড়ে তুলতে এমন নেশা লাগতে পারে কখনো ভাবি নি। আর আমি আমার মতো একটা মেয়েও যে এতগুলো লোকের কাছে এত মূল্যবান হয়ে উঠতে পারি কে ভেবেছিল।

ওরা জানতে চায়, শিখতে চায়, যতোটা পিছিয়ে আছে সবখানি এগিয়ে যেতে চায়। কিন্তু সে কি সহজ! এ শহরে এই একটি মাত্র মেয়েদের স্কুল, কিন্তু না আছে তার গ্রাণ্ট, না আছে টিচারদের ব্যবস্থা। আর না আছে এমন কি বইখাতা কিনতে পারার উপায়। স্কুলের জন্য যারা গ্রাণ্ট দিতে পারে তারা দলে টানার কলহ নিয়ে মেতে আছে ঢাকায়। এক দিস্তে কাগজ দুটাকা। মাঝে মাঝে ধমক দিয়েছি ঃ

'কজনের বই খাতা নেই দাঁড়াও।'

দু-চারজন বাদে প্রায় সকলেই উঠে দাঁড়িয়েছে!

ক্ষেপে গিয়ে বলেছি, 'কাল খাতা না আনলে পড়াব না। ক্লাসের বাইরে বসে থাকতে হবে!'

পাঁশুটে চুলে বেণী পাকানো, আঙুলে মেহেদীর রঙ ছোবানো কচি কচি বোকা বোকা মেয়েগুলো মুখ শুকনো করে ধমক মেনে নিয়েছে। কিন্তু পরের দিন স্কুলে আসতে সাহস পায় নি। ভয়ে ভয়ে ঘোরাঘুরি করেছে বারান্দায়। ভয়ে ভয়ে বলেছে, দিদির্মণি বাজান আপনাকে কি ক'তে চায়।

বাজান? সে কেন আবার। কোথায় সে? স্কুলের বারান্দা থেকে ওরা ভয়ে ভয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে দূরে, স্কুলের সামনেকার রাস্তাটার ওপাশে যেখানে একটা সাইকেল রিক্সা থেমে আছে। তার সামনে গামছা দিয়ে গায়ের ঘাম শুকোতে শুকোতে বিনীতের মতো দাঁড়িয়ে আছে একটা আধবুড়ো চওড়া পিঠওয়ালা লোক।

'ওই তোমার বাজান? রিক্সা চালায়?'

'জী।'

গেটের সামনে এগিয়ে গিয়ে ইশারা করে ডাকতেই লোকটা এগিয়ে এসেছে কৃতার্থের মতো: অসীম শ্রদ্ধায় মিনতি করে জানিয়েছে, তার মেয়েটাকে যেন দিদিমণি দয়া করে ক্লাসে বসতে দেন। ভারি লেখাপড়ায় শখ। বাপ রিক্সা চালক—কিন্তু মেয়েটা অন্তত লেখাপড়া শিখুক। দিনকাল ভারি খারাপ পড়েছে—তবু কাগজ এক দিস্তা সে যেমন করে হোক কিনে দেবে।

চওড়া পিঠে দাদ ঘা নিয়ে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত দাড়িওয়ালা একটা লোক বসে থেকেছে স্কুলের পাশে রাস্তার ওপর। বিকেল বেলা ছুটি হবার সময়মাত্র হঠাৎ জানা গেল—লোকটা এসেছে চর থেকে। না, ওর নিজের মেয়ে নয়। ওর সরিকদের মেয়ে। কিন্তু সারা গাঁয়ে ওই একটি মেয়েই তো শহরের স্কুলে পড়ছে! খালা আম্মা সাধ করে তাই তাকে নিজের বাড়িতে থাকতে দিয়েছে। শহরে এসেছিল তাই ভাবল একবার দেখে যায় কেমন লেখাপড়া করছে।

'তাই বলে সারাদিন ওই রাস্তার ওপর বসে বসে কি দেখলে তুমি?'

লোকটা বোকার মতো হেসেছে। তারপর গামছার খুঁট থেকে ময়লা ময়লা একটা নোট আর কিছু খুচরো কাঁপা কাঁপা হাতে গুণতে গুণতে কৈফিয়ত দিয়েছে—পাটের দাম পাওয়া যায় না। জলের দরে পাট সব বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। কি করা। এই কটি পয়সা পাওয়া গেছে। মেয়েটার নাম যেন দিদিমণি না কেটে দেন। এই পয়সা সে এনেছে কুড়িয়ে বাড়িয়ে। তারই গাঁয়ের মেয়ে তো। আর তো কেউ লেখা-পড়া ও গাঁয়ে শেখেনি····

মেয়েদের কথা ছেড়েই দিলাম। কিন্তু মেয়েদের এমনি ধারা হাজার পেশার হাজার রকম অভিভাবকদের বয়স্ক, মেহনতি চোখ-গুলোর দিকে যদি কখনো তাকিয়ে দেখতে তবে বুঝতে স্বপ্ন কাকে বলে। বিশ্বাস করো, মাঝে মাঝে সারা রাত আমার ঘুম আসত না ওই কর্কশ, আনাড়ী, পরিশ্রান্ত, আর স্বপ্নাতুর চোখগুলোর কথা ভেবে।···

কিন্তু তার পরের কথা তো তুমি কাগজে পড়েছ। এ দেশটাও পাল্টাতে লাগল। সেই সিরাজুল? এতদিন আমাকে এড়িয়ে চলত। একদিন আবার সেই জ্বলজ্বলে কবির মতো চোখে আমার দিকে তাকিয়ে হাতে একটা কাগজ গুঁজে দিলে। না এবার আর চিঠি নয়, ইস্তাহার: রাষ্ট্রভাষা বাঙলা চাই। আমাদের স্কুলের ছাত্রীরা কোনোদিন ধর্মঘট করেনি। কি করতে হয় জানত না। অথচ আবেগে আর রোমাঞ্চে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আমাকেই তাই বলে দিতে হল, 'কেন এসেছ! যাও বাইরে চলে যাও! ক্লাস না করে সভা করোগে যাও।'

বলতে লজ্জা নেই, কেমন করে সভা করতে হয় তা আমিও জানতাম না। তবু, আমরা দিদিমণি আর ছাত্রীরা সকলেই চেঁচাতে লাগলাম কেন কে জানে। দুধওয়ালার মেয়ে আনোয়ারা তার নোংরা পাঁশুটে চুলের বেণী দুলিয়ে ছোটাছুটি করে বেড়াল সবচেয়ে বেশি। তারপর ঢেউয়ের পর শুধু ঢেউ। উল্লাসের পর শুধু উল্লাস। নির্বাচনে পুরনো কর্তরা হেরে গেলেন।

আর একদিন মীরাদিও ফিরে এলেন জেল থেকে। দৌড়ে গেলাম তাঁকে জড়িয়ে ধরতে। আদালতে মীরাদির চেহারা আমি দেখিনি। মনে মনে কল্পনা করে নিয়েছিলাম বেণী না-বাঁধা পাঞ্চালীর মূর্তিটা। আমি খিড়কির পথ সন্ধান করেছি। মীরাদি গিয়েছিলেন সদর দরজা দিয়ে। পায়ের ছাপে রক্ত লেগেছিল। আজ মাথা উঁচু করে সেই সদর দরজা দিয়েই ফিরছেন মীরাদি। তাঁর দিকে তাকিয়ে একমুহূর্ত থমকে রইলাম। তারপর জাপটে ধরে বুকের মধ্যে মুখ রেখে বলেছিলাম, পাঞ্চালী এবার বেণী বাঁধুক মীরাদি? যা বলেছিলেন তাই তো ফলল। ওরাই আপনাকে ধরিয়ে দিয়েছিল, আজ ওরাই শ্রদ্ধা করে ফিরিয়ে এনেছে আপনাকে!

মীরাদি অন্যমনস্কের মতো হাসলেন। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, 'কিন্তু তবু কি একটা বাকি রয়ে গেল সীতা। পরাজয় দেখেছি, জয় দেখলাম, কিন্তু···না তোকে বোঝাতে পারব না।'

মীরাদি কি ভেবে ওকথা বলেছিলেন জানি না। কিন্তু দেখা গেল যতো সহজ ভেবেছিলাম, জয়টা ততো সহজ নয়। কাগজে দেখেছো, হঠাৎ সবকিছুকে উপহাস করে নেমে এল সেকশন ৯২—গবর্ণরের শাসন, আমেরিকার হুকুমনামা। উল্লাস এক মুহূর্তে পালটে গেল সন্ত্রাসে। শুনলাম মীরাদি আবার কোথায় আত্মগোপন করেছেন। সিরাজুল গ্রেপ্তার হয়েছে। হবেই তো, কবি ছাড়া আর কে এগিয়ে যাবে! সেদিন রাত্রেও আমি কেঁদেছিলাম আর শ্যাওলা-ধরা দেয়ালটার ভেতর আমাদের সংসারে আবার উঠল সেই আতঙ্কিত গুঞ্জন: না আর পারা যাবে না! চলো যাই···

এতদিন পরে এই প্রথম কী রকম অসহ্য লাগতে লাগল আমার। চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, 'কেন বার বার ওকথা বলো। যাবে তো কেন যাও নি এতদিন? কেন যাও নি!'

আমার কথায় কেউ জবাব না দিয়ে এই প্রথম চুপ করে গেল সবাই। কিন্তু তাতে কতটুকু আমার শান্তি? শহরটায় টহল দিয়ে

ফিরতে লাগল পুলিসের জীপ। আমি ঘাড় গুঁজে স্কুলে যাই। নিঃশব্দে ফিরে আসি। একদিন পড়াচ্ছি—হঠাৎ আনোয়ারা ছুটে এল, দিদিমণি পুলিস !

ধর্মঘট করতে হলে কি করতে হয় জানতাম না। পুলিস এলেও কি করব জানি না। ত্রস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম একবার। ভাবলাম কোনো একটা দিকে হাঁটি। কিন্তু দাঁড়িয়েই রইলাম। ক্লাসের মেয়েরাও মৃদু গুঞ্জন করে তারপর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। দারোগা সোজা এসে ঢুকল। ওয়ারেণ্ট বার করে বললে, যেতে হবে।

যে গাড়িখানায় উঠলাম সেটা ঠিক প্রিজন ভ্যান নয়। এ শহরে প্রিজন ভ্যান এখনো নাকি আসে নি। খোলা-মেলা একটা পুলিস ট্রাক। গাড়ি ভর্তি করে কেবল বন্দুকের পাহারা। রাস্তায় আরো গোটা দুই স্কোয়াড ভিড় ঠেকাচ্ছে। হঠাৎ চমকে উঠলাম। আমি একা নই, মীরাদিও আছেন ট্রাকের এক কোণে, দাঁতে দাঁত চেপে। প্রথম যেবার মীরাদি গ্রেপ্তার হন, তখন তাঁর চেহারা দেখিনি। কিন্তু এই-ই বোধ হয় সেই বেণী খোলা পাঞ্চালীর মূর্তি ! শুকনো রোগা মুখখানার জ্বলজ্বলে চোখ দুটো তাঁর চেয়ে আছে কী এক অসহ্য প্রতীক্ষায়। কপালের সেই গুঁড়ো গুঁড়ো এলোমেলো চুলগুলো উড়ছে দপ্‌দপিয়ে। গায়ের আঁচল অর্ধেক খসা। শীর্ণ বয়স্ক গালের ওপর আবেগের কি একটা আশ্চর্য আভা আগুন ছড়াচ্ছে লাল হয়ে!

আমাকে দেখেও মীরাদি তাকালেন না। শুধু মৃদুস্বরে বললেন, বলেছিলাম, ওরা একদিন আমাকে ছিনিয়ে আনবে। কিন্তু হয়ত এবারেও পারল না রে।

আমি ফিসফিসিয়ে বলেছিলাম, কিন্তু রাস্তায় ভিড় জমছে মীরাদি। পুলিস ঠেকাবার চেষ্টা করছে !

গাড়িটা ছাড়তে দেরি হচ্ছিল, হয়ত ভিড়ের জন্যে, হয়ত অন্য কারণ ছিল। দুটি বসে থাকা মেয়ের চারদিক ঘিরে কর্কশ রোমশ, বুটপরা, মোজা আঁটা পুলিসী পা-গুলো অরণ্যের মতো খাড়া দাঁড়িয়ে আছে।

তারই ফাঁক দিয়ে আমি তাকিয়ে আছি রাস্তাটার দিকে। অসহ্য উদ্বেগে ধুকধুক করছে বুক। সত্যিই ভিড় জমছে। সেই ভিড়—যাদের আমি জানি, অথচ কখনো চিনি নি—শহরের রাস্তার সেই দুধওয়ালা, কাঠওয়ালা, রিক্সাওয়ালা, দু'চারজন ভদ্রলোক, একদল ছাত্র, আমাদের স্কুলের সেই মেয়েরা, আর তারপরেও আবার সেই কাঠওয়ালা, নিকিরি, চরের চাষী, সেই উঁচু করে গোঁজা নোংরা লুঙ্গি, কর্কশ দাড়ি, ছেঁড়া ফতুয়া, চওড়া চওড়া কাদালাগা দাদ-ভরা পিঠ—সেই ভয়ঙ্কর একাকার মূর্তি আমি যাকে জেনে এসেছি ভয় বলে! কী হবে! কী করবে ওরা!

হঠাৎ সেই এলোমেলো পাঞ্চালীর মূর্তিতে চেঁচিয়ে উঠলেন মীরাদি সীতা ছাখ। দেখেছিস! তোর জন্মভূমি দেখে নে রে সীতা, তোর জন্মভূমি!

আর ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলেন, 'ওরা আমাদের ছিনিয়ে নিতে পারল না। কিন্তু ছাখ ছাখ, ওরা কাঁদছে, সীতা ওরা কাঁদছে।'

চমকে তাকিয়ে দেখলাম, বয়স্ক কর্কশ, অসুন্দর, অপরিচিত ভিড়টার চোখে জয় নয়, পরাজয় নয়, চিকচিক করছে কী এক আশ্চর্য চোখের জল।

পদ্মা আমার পুরো দেখা আজো হয় নি। কিন্তু জন্মভূমি আমি পেয়েছি। তুমি তোমার স্বদেশ খুঁজে পেলে সুব্রত? তোমার জন্যে এখনো অপেক্ষা করে আছি, অপেক্ষা করে থাকব। মনে আছে, তুমিই তো বলেছিলে, জন্মভূমি নইলে কোথায় দাঁড়িয়ে আমরা ভালোবাসব!

—সীতা।

